দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বিদেশি অনুদান (সংশোধনী) বিল - ২০২৬

সার্বভৌমত্বের পাঁচিল

—পৃঃ ১১

বিদেশি অনুদান (সংশোধনী) বিল - ২০২৬

এত আপত্তি কেন ?

—পৃঃ ৩৫

৭৮ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা।। ৩১ আগস্ট, ২০২৬।। ১৩ ভাদ্র, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

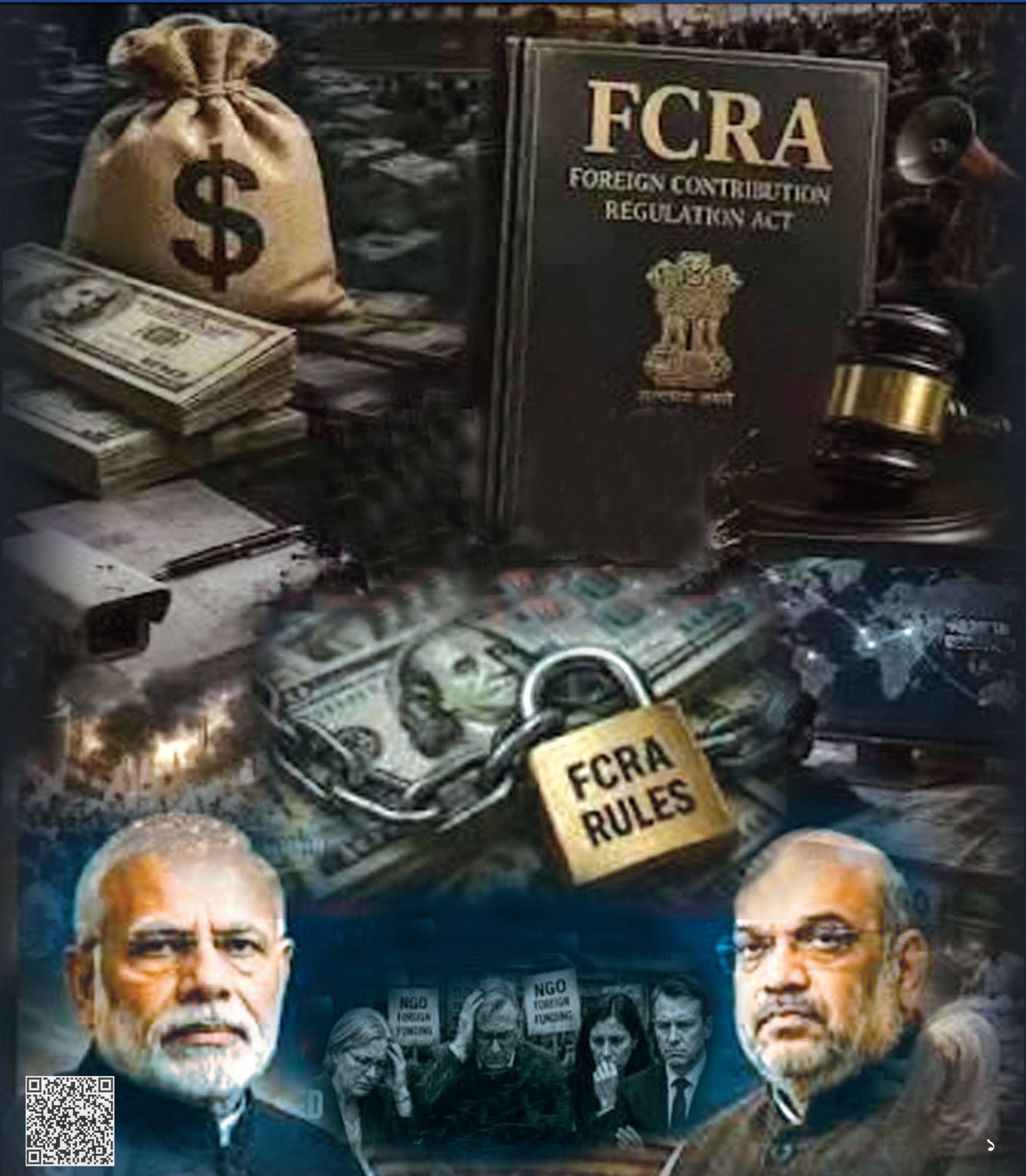

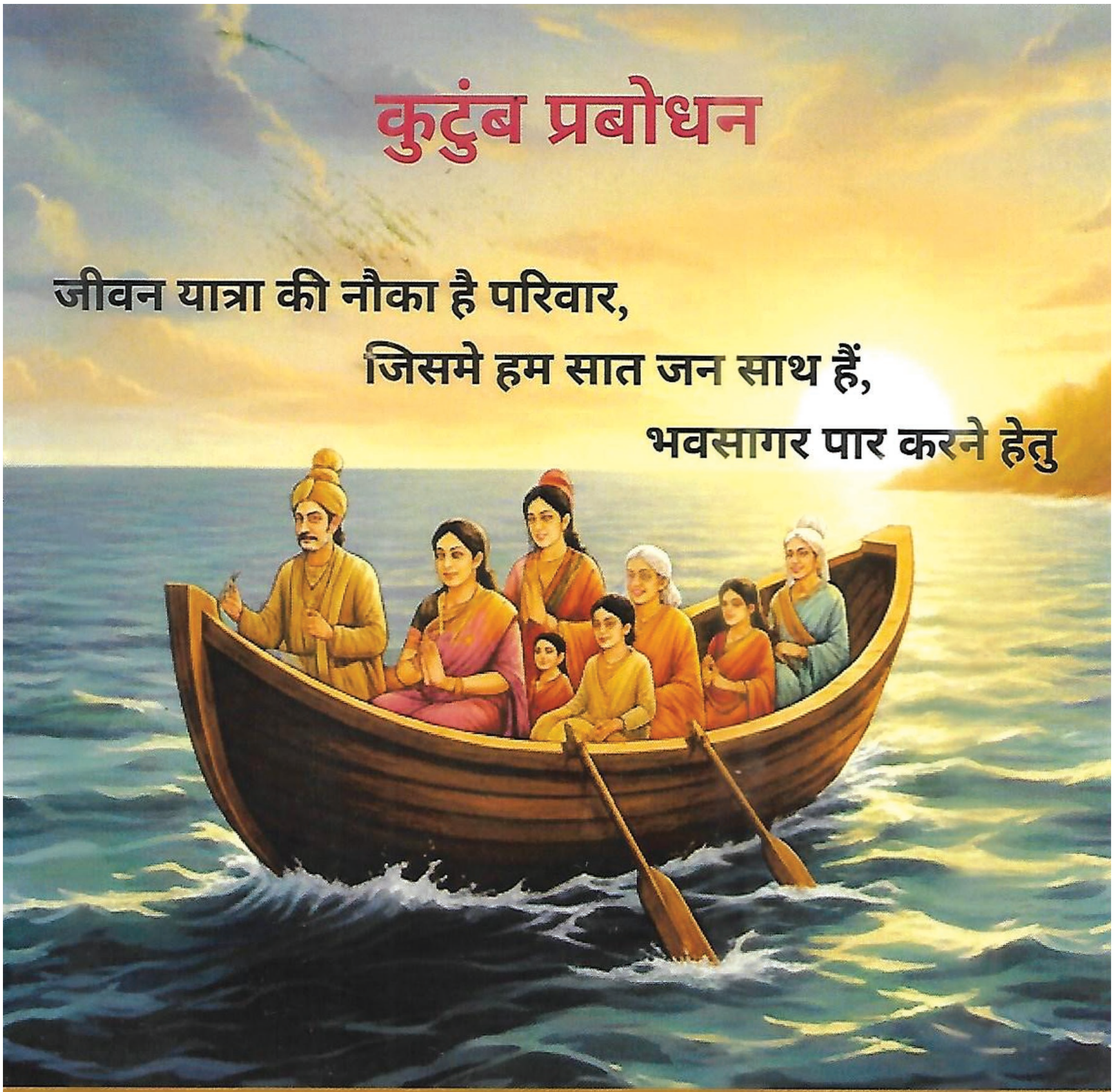

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৩১ আগস্ট - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

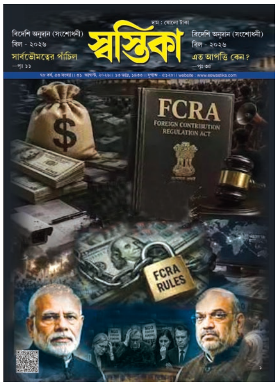

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

চাই ‘বাম মুক্ত’ রাজ্য, তাই তার কুপাঠ ধ্বংস করতে হবে : ‘যারে তুমি পিছে ফেল’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

গৃহেই বন্দি থাকুন দিদি! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রাজপথ বনাম সংসদ : বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সতর্কবার্তা এবং বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা ◻ অতুল লিময়ে ◻ ৮

এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পেশ হওয়ার পর গড়ে ওঠা ‘আন্দোলন’ আরশোলাদের চরিত্র সম্পূর্ণ উন্মোচন করেছে ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বিদেশি অনুদান (সংশোধনী) বিল ২০২৬ : সার্বভৌমত্বের পাঁচিল ◻ ডঃ রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১১

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ কবে বন্ধ হবে? ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৩

এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ : বিদেশি টাকার দালালদের বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত যুদ্ধ ◻ দীপল বিশ্বাস ◻ ১৫

এফসিআরএ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬ নিয়ে বিরোধীদের এত উষ্মা কেন? ◻ ডঃ তরুণ মজুমদার ◻ ১৭

হারানো পত্রিকা—উপাসনায় মুগ্ধ ছিল বঙ্গ ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশ্বদূত : পরমহংস যোগানন্দের ঐতিহাসিক প্রভাব ◻ সুব্রত বাঁশ ◻ ৩৪

এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬-এ আপত্তি কেন? ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ৩৫

কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের আঞ্চলিক বেঞ্চ—সময়ের দাবি ◻ জ্যোতি চ্যাটার্জী ◻ ৪৩

‘হিন্দু গ্রোথ রেট’ : প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে নতুন করে ফিরে দেখা এক পুরনো বয়ান ◻ জয়দীপ ভট্টাচার্য ◻ ৪৫

সংসদীয় রীতি-নীতি এবং বিরোধীদের ভূমিকা ◻ রানার চট্টোরাজ ◻ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৭ সেপ্টেম্বর
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৭ সেপ্টেম্বর
২০২৬

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীদের দৌরাত্ম্য

পূর্বতন সরকারের নীতির কারণে এরাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কোনো নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই। এমতাবস্থায় গত ১৯ আগস্ট রাত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেটসু- সাধারণ সভা ডাকে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র সংগঠন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তারা এর প্রতিবাদ জানালে বামপন্থীদের হাতে তাঁরা নিগৃহীত হন। এর পালটা প্রতিরোধ তুললে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অশান্ত করে তোলে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি। বিভিন্ন তথ্যকে ভুলভাবে পরিবেশন করে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর ন্যারেটিভ খাড়া করার প্রয়াস চালায় এবং এতে সমর্থন জোগায় একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম একাধিপত্যের রক্তাক্ত ইতিহাস, শ্রীঅরবিন্দ-র স্মৃতিবিজড়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আঁতুড়ঘরে পর্যবসিত হওয়া এবং সাম্প্রতিক ঘটনাক্রমের বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষ পূর্ণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী

পাঠান-মুঘল, ইংরাজ প্রভৃতি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রবেশের বহু পূর্ব হইতেই মোল্লা-মৌলবি ও মিশনারির দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এই দেশে বৈদেশিক শাসনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়াছে। রাজানুগ্রহে তাহারা অবাধে ভারতবর্ষের মানুষকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। ইতিহাসে ইহারা পঞ্চমবাহিনী নামে পরিচিত রহিয়াছে। শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত থাকে নাই, ধর্মান্তরিতদের ভারতবিরোধী করিয়াছে, রাষ্ট্র বিরোধী করিয়াছে। জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করিলে বলিবার কিছু ছিল না, উদ্বেগের বিষয় হইল, ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাষ্ট্রান্তর ঘটানো হইয়াছে। এই ধর্মান্তরিতরাই এক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার পরেও এই পঞ্চমবাহিনী অবাধে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া চলমান রাখিয়াছে। বিভিন্ন মিশনারি সংস্থা চিকিৎসা, শিক্ষা ও ত্রাণের লোভ প্রদর্শন করাইয়া সেবার আড়ালে এই দেশের মানুষ বিশেষ করিয়া দরিদ্র ও জনজাতি সমাজের মানুষদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিয়া চলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ইহার জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে প্রাক-স্বাধীনতাকাল হইতেই বিদেশি অনুদান ভারতে প্রেরিত হইতেছে। দেশের স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার ইহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অথবা বিদেশি শক্তির চাপে তাহার বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রভক্ত সাংসদদের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার প্রায় দুই দশক পর শুধুমাত্র ধর্মান্তর বিরোধী আইন প্রণয়ন করিলেও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অতীতে নিয়োগী কমিশন-সহ বিভিন্ন কমিশন বৈদেশিক মিশনারি সংস্থাগুলির কার্যপদ্ধতি লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে এবং আইনি নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছে। কিন্তু মিশনারিদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কারণে তাহা কার্যকর হইতে পারে নাই। তাহার ফলেই যেমন অবাধে বৈদেশিক অনুদান আসিয়াছে, তেমনই দেশবিরোধী কার্যকলাপও সমানতালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করিয়া মণিপুরে যে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ ও অবাধ ধর্মান্তরের ফলে সেখানকার জনবিন্যাস পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। ভারত যাহাতে শক্তিশালী হইতে না পারে তাহার জন্য বিদেশি অনুদানের সাহায্যে ভারতবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৈদেশিক শক্তির দাবার বোড়ে হিসাবে এই দেশে কাজ করিতেছে বাম, অতিবাম দলগুলি। ইদানীং কংগ্রেস তাহাতে শামিল হইয়াছে। এই কংগ্রেস দলটিই ১৯৭৬ সালে বিদেশি অনুদানে স্বচ্ছতা আনয়ন করিবার জন্য 'বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ' আইন প্রণয়ন করিয়াছিল। তাহারাই ২০১০ সালে পুরাতন আইনটি বাতিল করিয়া এফসিআরএ-২০১০ আইনটি প্রণয়ন করে। কিন্তু কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে তাহার কার্যকারিতা ছিল না।

২০১৪ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাসীন হইয়াই বিদেশি অনুদানে স্বচ্ছতা আনয়ন করিবার প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে। গত পনেরো বৎসরে শুধুমাত্র অনিয়মের জন্য ২২ হাজার এনজিও-র লাইসেন্স বাতিল করিয়াছে। ২০২০ সালে কংগ্রেসেরই প্রণীত আইনে কিছু সংশোধন করা হইয়াছিল। দেশের সার্বভৌমত্বে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় উপরোক্ত আইনে সংশোধনী আনিয়াছে। এই বিলের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও, ট্রাস্ট, অ্যাসোসিয়েশন বা কোম্পানির বিদেশ হইতে অনুদান, তহবিল গ্রহণ ও ব্যবহারে কঠোর নিয়ন্ত্রণের কথা রহিয়াছে। বিলটি গত ২৫ মার্চ লোকসভায় পেশ করা হইয়াছিল। তাহাতেই ভারতবিরোধী বৈদেশিক শক্তিগুলি প্রমাদ গনিয়া ভারতকে অশান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সিজেপি'র পরিচালনায় একটি তথাকথিত ছাত্র আন্দোলনে সর্বতোভাবে সমর্থন দান করে। এহেন আন্দোলনের পশ্চাতে শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশের ন্যায় নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্র ছিল। দুর্ভাগ্যের যে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিপক্ষ দলগুলি বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা লোকসভায় বিলটির বিরোধিতাও করিয়াছে। ফলে গত ১২ আগস্ট বিলটিকে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ করিতে হইয়াছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়া আগামী শীতকালীন অধিবেশনে প্রথম সপ্তাহের অন্তিম দিনের মধ্যে কমিটিকে তাহাদের প্রতিবেদন জমা করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে পুনরায় একবার প্রমাণিত হইল যে, কমিউনিস্টরা তো বটেই, কংগ্রেস দলটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মোটেই আগ্রহী নয়। দেশবাসীর নিকট ইহা পরিষ্কার যে, ভারতের রাজনীতিতে যতদিন কংগ্রেস দলের উপস্থিতি থাকিবে, ততদিন ভারত নিরাপদ নহে।

সুভাষিতম্

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।। (হিতোপদেশ)

অর্থ ঃ যে বাড়ি থেকে কোনো অতিথি নিরাশ হয়ে ফিরে যায়, সেই অতিথি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে গৃহস্থের পুণ্য নিয়ে চলে যায়।

চাই 'বাম মুক্ত' রাজ্য, তাই তার কুপাঠ ধ্বংস করতে হবে

'যারে তুমি পিছে ফেল'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বাম বিদায় নিয়ে রাজ্যপাটে লেখা বেরোনোর কয়েক সপ্তাহের ভেতর 'যমপুর বিশ্ববিদ্যালয়' বাম গড়ের কফিনে পেরেক পোঁতার কাজ শুরু হয়েছে। সে কাজ চলবে বলে শুনেছি। ছত্তিশগড়ের আবুজমাড়ে যে কাজ শুরু হয়েছিল যমপুরে এসে তা শেষ হবে। বামমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকেই ছিল। ১৫ বছর ধরে তস্কর সরকার তা আটকে রেখেছিল।

রাজ্যের পুনর্গঠনে নতুন বিজেপি সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। আশেপাশে করা রয়েছে আর কারাই-বা জনগণের চোখে বসন্তের কোকিল। জনগণের কাছে তারা প্রত্যাখ্যাত হলেও কিছু কেষ্ট-বিষ্টুর দয়ায় দলের নাম ভাঙিয়ে করেকর্মে খায়। পাঁচ দশক ধরে বিদেশি সিপিএম থেকে তস্কর সরকারের শাসনকালে সমাজবিরোধিতা আর তোলাবাজি সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছিল। যারা দুই কাজ একসঙ্গে করত তারা ছিল সেই সরকারের চোখের মণি। ওই জমানাতে তাই এমন কোনো নজির নেই যেখানে কোনো নেতা চরম দোষে চরম শাস্তি পেয়েছে বা তাকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে ধানতলা, বানতলা, নেতাই, নন্দীগ্রাম আর কেশপুর থেকে শুরু করে মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদ, সন্দেশখালি আর আরজি করে অভয়াকাণ্ডে সকল অপরাধী কোনো না কোনোভাবে রেহাই পেয়ে গিয়েছে।

তবে অভয়া কাণ্ডে নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে। সত্তরের দশকে নকশাল অত্যাচারের সময় ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা হেমন্ত বসু হত্যার তদন্ত দু'বার করে হয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সরকার প্রথমটায় হত্যার মামলার তদন্ত ভার দিয়েছিল লালবাজার সদর পুলিশের বম্ব (বোমা আর বিস্ফোরক) বিভাগের অফিসারদের। পরে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ভক্তিভূষণ মণ্ডলের করা নতুন মামলায় সে তদন্ত হোমিসাইড বিভাগকে দেওয়া হয়।

রাজ্যপাটে আগেই লেখা হয়েছে (যাহা যায় তাহা যায়--- ২৫-০৫-২০২৬) পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার একবার চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। এ রাজ্যের ইতিহাস তাই দাবি করে। ফলে বিজেপির সামনে এখন খোলা জমি। পনেরো বছরের তস্কর সরকার অনেকটাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিদেশি বাম আর পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস রাজনৈতিক ভাবে একেবারে নগণ্যে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় বিজেপির বিরুদ্ধে এখন আর প্রায় ঘুরে দাঁড়ানো কেউ নেই। কিন্তু মুশকিলটা অন্য দলের বাড়বাড়ন্তের নয়। জনগণের মুখোমুখি হওয়ার চাপ। তা যে কোনো রাজনৈতিক দলের চাপের থেকে বহুগুণ বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য রাজ্যে এমনটা যে নেই তা নয়।

> "বিদেশি বাম আর পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস রাজনৈতিক ভাবে একেবারে নগণ্যে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় বিজেপির বিরুদ্ধে এখন আর প্রায় ঘুরে দাঁড়ানো কেউ নেই। কিন্তু মুশকিলটা অন্য দলের বাড়বাড়ন্তের নয়। জনগণের মুখোমুখি হওয়ার চাপ।"

হিন্দুত্ববাদী ভাবনার আকর হলো সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে অসত্যকে ধ্বংস করা। সত্য আর অসত্যের মধ্যে যে ফারাক সেই ফারাককেই প্রতিদিনের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে আগের তিনটি জমানা— কংগ্রেস, বাম আর তস্কর। আর তাতেই সৃষ্টি হয়েছে এ যুগের কিছু অসুর। এই ৫ শতাংশকে নিয়েই এ রাজ্যের বিজেপির মূল শিরঃপীড়া। তবে এদেরকে যে ফেলতে হবে আর প্রয়োজনে উপড়ে ফেলতে হবে সে নজির বিজেপিকেই সৃষ্টি করতে হবে। ইতিমধ্যেই ২০০ জন বিজেপি নেতাকে বিভিন্ন এলাকা থেকে দলীয়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের আটক বা গ্রেপ্তার করা সমস্যা নয়। সমস্যাটা গভীরে— ভোটার আর জনগণকে নিয়ে। যদি ২ শতাংশ মানুষ বা ভোটারের ধারণা হয় যে বিজেপি ১৫ বছর ধরে রাজ্যে চলা তস্কর দলের অন্যপিঠ ভিন্ন কিছু নয় তাতে ৯০ শতাংশ ভোটার বিজেপির থেকে সরে যেতে দ্বিধা করবে না।

এবারের ভোটে ১০০ জনে ৯৪ জন ভোট দিয়ে তস্কর সরকারকে সরিয়েছে। ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে বড়ো নির্বাচন বলতে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোট। ১২৪টি পৌর নিগমের নির্বাচন আর ২০২৮-এর পঞ্চায়েত ভোট। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপনির্বাচন। কিন্তু ৫টি বিজেপি শাসিত আর ২টি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে ২০২৭-এ যে ভোট হতে চলেছে তার প্রভাবও এখানে পড়তে পারে। প্রধানভাবে উত্তরপ্রদেশের ভোটে কী হয় সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়। তাই মনে রাখা দরকার 'যারে তুমি পিছে ফেলো সেই তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

গৃহেই বন্দি থাকুন দিদি!

দিদি,

মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়ে সে ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। তাতে আপনি দেখলাম বিস্তর রেগেছেন। আমিও রেগেছি। এমনিতেই আপনাকে ভবানীপুর তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘরে বসিয়ে দিয়েছে। যে কাজ হয়ে গিয়েছে সেটা আবার মুখ্যমন্ত্রী করতে যাবেন কেন! শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন কেন! আমার রাগটা এই কারণেই।

রাজ্যে তো আবার 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়' আইনকে কার্যকর করল রাজ্য সরকার। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''এবার থেকে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, পুলিশকে আক্রমণ, থানা জ্বালানো, বিডিয়ো অফিস জ্বালানো হলে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণও আদায় করা হবে। ক্ষতিপূরণের অঙ্কের তিন গুণ আদায় করা হবে। ক'দিন আগে করিমপুরে গিয়ে ইলেকট্রিক অফিসের লাইন কেটেছিল, সেখানেও গ্রেপ্তার করেছি। ক্ষতিপূরণও আদায় করব।'' বুঝেছেন কেন ঘরে থাকাই ভালো। আপনি এখন আবার বিরোধী নেত্রী হিসেবে রাস্তায় বার হলে কী করতে কী করে ফেলবেন তার তো ঠিক নেই। তাই ঘরে থাকাই ভালো।

রাজ্য বিধানসভায় দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার আইনের সংশোধনী পাশ এনেছিল রাজ্য সরকার। তার বলেই রাজ্যে 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার' আইনকে কার্যকর করল রাজ্য সরকার। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা রোখার সংশ্লিষ্ট আইনে রাজ্যপাল সই করে দেওয়ার পরে রাজ্য সরকার তা বিধি হিসেবে কার্যকর করে দিয়েছে। এ নিয়ে

যাঁরা 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' স্লোগান তুলছেন, তাঁদের মুখ সেলাই করে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু এই সরকার নিয়ে নেবে। এখন যা অবস্থা তাতে এ রাজ্যে থাকতে গেলে বন্দে মাতরম্ গাইতে হবে।

স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে। বিধানসভায় গুন্ডা দমন আইনও পাশ করেছিল সরকার। গুন্ডা দমন আইনের একটি অংশ রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য গিয়েছে। সম্মতি পাওয়া গেলে সেটিও বিধি আকারে কার্যকর করা হবে।

এই প্রসঙ্গে দিদি একটা কথা বলি আপনি যেটা করেননি সেটা এবার হবে। হবেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রদের হস্টেল চত্বরে দেশবিরোধী দেওয়াল লিখন বা ছবি রয়েছে! কিছু আপত্তিকর ভিডিয়ো এবং ছবি আমিও দেখেছি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তিও দেওয়া হবে।

আপনিই বলুন দিদি, আপনার অবর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস চত্বরকে বিকৃত প্রচার এবং ভারত-বিরোধী মনোভাব ছড়ানোর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া যায়! রাজ্যের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এখনকার সরকার যে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করে চলেছে তাতেও সমস্যা তো আছেই।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অসামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হয়ে না-ওঠে। যেটা আপনি বলতে পারেননি সেটা এখনকার সরকার বলছে। কতটা করতে পারে দেখা যাক। তাই না দিদি! এর বেশি আর কী বলবেন আপনি। একদিন ফেসবুকে এসে এটা বলে দিন। মাঝে মাঝে ফেসবুকে আসেবন দিদি। সেটা না হলে আপনার উপস্থিতির টের পাব কী করে। চিন্তা হয় তো নাকি!

আপনার আমলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দে মাতরম্ গাইতে দেওয়া হতো না। জাতীয় পতাকা উড়ত না সেখানে। শিক্ষা দপ্তরকে ঢুকতে দেয়নি। সিসিক্যামেরা লাগাতে দেয়নি। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রবোধের সঙ্গে আপোশ করে চলেছেন আপনি। যাঁরা 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' স্লোগান তুলছেন, তাঁদের মুখ সেলাই করে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু এই সরকার নিয়ে নেবে। এখন যা অবস্থা তাতে এ রাজ্যে থাকতে গেলে বন্দে মাতরম্ গাইতে হবে।

অতিথি কলম

অতুল লিময়ে

রাজপথ বনাম সংসদ

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সতর্কবার্তা এবং বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিকদের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, কারণ তাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে আস্থা নেই এবং তারা 'বিপ্লব'-এর নামে ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোকেই উৎখাত করতে চায়।

তারুণ্যের মূল বৈশিষ্ট্য হলো অদম্য শক্তি, সাহস, দুঃসাহসিকতা ও আত্মত্যাগের মানসিকতা। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠে যে গান গুঞ্জরিত হয়, তা আসলে একটি জাতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্দেশ করে। এই গান কেবল সুর নয়— এটি তরুণদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ এবং জীবনদর্শনের বাস্তব প্রকাশ। যদি এই সুর দেশপ্রেম, সংহতি, সাহস ও উদ্ভাবনের হয়, তবে দেশএক ইতিবাচক দিশা পায়। বিপরীতে, সেই তারুণ্যের মাঝে যদি ক্ষোভ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হতাশা ও উদাসীনতা বাসা বাঁধে, তবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্থায়িত্ব গভীর সংকটে পড়তে বাধ্য। এই প্রেক্ষাপটেই তরুণ সমাজের মাঝে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা সামাজিক সংগঠনগুলির প্রাসঙ্গিকতা আজ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া সিজেপি আন্দোলনকে একটি বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ হিসেবে না দেখে এক গভীর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত 'কেস স্টাডি' হিসেবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সিজেপি আন্দোলনটি সম্প্রতি জনসমক্ষে এলেও, এটি কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে চলমান একটি ঘটনা। এই আন্দোলনটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হলে--- এর ঘটনাক্রম, এই আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি, আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার জন্য রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা বা এই আন্দোলনের সাপোর্ট সিস্টেম এবং এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্বের দ্বারা সংঘটিত নানা সামাজিক-রাজনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষার সামগ্রিক পর্যালোচনা আবশ্যক। এছাড়াও খতিয়ে দেখতে হবে এই আন্দোলনের পিছনে ক্রিয়াশীল মতাদর্শের প্রকৃত স্বরূপ। অনুধাবন করতে হবে যে, কীভাবে ছাত্রস্বার্থে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি মাঝপথে বদলে গেল, গোড়ায় আন্দোলনের নেতৃত্বদান সিজেপি করলেও পরে কোন কোন সহযোগী সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত হলো, কীভাবে এটি ছাত্র-আন্দোলন থেকে একটি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হলো এবং কীভাবে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হলো। এই ধরনের 'আন্দোলন' ও 'বিক্ষোভ'-এর পিছনে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দর্শনকে সম্যকভাবে অনুধাবন করা জরুরি। আন্দোলনটি শুরু হওয়ার পর এই আন্দোলনের পরিণতি কী হয়েছিল তার বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ। এই পুরো প্রক্রিয়াটির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রয়োজন।

মরাঠাওয়াড়ার অভিজিৎ দিপকে-র হাত ধরে শুরু হওয়া এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে জনসমর্থন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল। গত ৭ থেকে ১৯ জুনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও তা বিশেষ সাড়া ফেলতে পারেনি। কিন্তু ২০ জুন থেকে যখন দিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের ধরনা-অবস্থান শুরু হলো, তখন থেকেই আন্দোলনের প্রকৃতি ও গতিপথ নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে থাকে।

প্রাথমিকভাবে এটিকে একটি ছাত্র আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরা হলেও, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর পেছনে এক বিশাল ও সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন (AISA) এবং স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SFI)-র মতো বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্রসংগঠন মঞ্চটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের মানবাধিকার সংগঠন, যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইট্স্ ওয়াচ, পিইউসিএল (PUCL) ও সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। বনবাসী ও জনজাতিদের অধিকারের নামে আন্দোলনকারী অল ইন্ডিয়া ইউনিয়ন অব ফরেস্ট ওয়ার্কিং পিপল্ (AIUFWP), বিরসা আম্বেদকর ফুলে

স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAPSA) এবং অল অসম ট্রাইবাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (AATSU)-কে এক ছাতার তলায় আনা হয়। নারী অধিকারের পরিসরে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রায় ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা 'পিঁজড়া তোড় কালেক্টিভ', ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন এবং জেন্ডার জাস্টিস কালেক্টিভ এই মঞ্চে শামিল হয়। এছাড়া স্টুডেন্টস্ ইসলামিক অর্গানাইজেশন, মুসলিম স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন কালেক্টিভ, ইউনাইটেড খ্রিস্টান ফোরাম, অল ইন্ডিয়া ক্যাথলিক ইউনিয়ন ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অব চার্চেস্ ইন ইন্ডিয়া-র মতো বিভিন্ন তথাকথিত সংখ্যালঘু সংগঠনকেও এই বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেশ কিছু আইনি সহযোগিতাদানকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশরক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন ও সাংবাদিকদের সংগঠন। এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন এবং এআইটিইউসি (AITUC)-র মতো কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন।

বিচ্ছিন্ন কার্যক্ষেত্রের এত বিপুল সংখ্যক সংগঠনকে কে বা কারা একই মঞ্চে সমন্বিত করল, তা নিয়ে সকলের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আন্দোলন মঞ্চ থেকে উচ্চারিত— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' জাতীয় দেশবিরোধী স্লোগান এবং সমস্ত বামপন্থী শক্তির এককাট্টা হওয়া স্পষ্ট করে দেয় যে কীভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয়েছে। স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে পরিচালিত এই আন্দোলন কেবল দিল্লিতে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার যে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল, তার আসল রূপটি প্রকাশ পায় যোগেন্দ্র যাদবের এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে— 'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আর সংসদ ঠিক করবে না, রাজপথ ঠিক করবে; নির্বাচন ঠিক করবে না— প্রতিরোধ ঠিক করবে'।

বামপন্থী তাত্ত্বিকরা এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে 'বিকল্প রাজনীতি' বা অল্টারনেটিভ পলিটিক্স হিসেবে তুলে ধরছেন। এটি আসলে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে ভেতর থেকে পঙ্গু করার সুপরিকল্পিত কৌশল। ইতালীয় মার্ক্সবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশ্চির 'কালচারাল হেজিমনি' বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো দেশে নিছক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সার্বিক বিপ্লব আনা যায় না; তার জন্য সেদেশের সমাজের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বাঁধন ধ্বংস করা আবশ্যক।

এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সনাতন আদর্শের 'ডিকনস্ট্রাকশন' বা বিনির্মাণ শুরু হয়েছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নারীবিদ্বেষী কিংবা দলিতবিরোধী হিসেবে চিত্রিত করে সামাজিক শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করার চেষ্টা এই বৃহত্তর চিন্তারই অংশ।

সংসদীয় গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে বামপন্থী চিন্তাধারা ভারতে এই বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে। এর প্রথম ধাপ হিসেবে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনে কৌশলগতভাবে বামপন্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে এবং ক্রিটিক্যাল থিয়োরি-র প্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যক্রম তৈরি করা হচ্ছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের মননে দেশের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীর অনাস্থা তৈরি করে।

পরবর্তী ধাপে বিচারবিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মতো সাংবিধানিক স্তম্ভগুলোর ওপর থেকে জনতার আস্থা নষ্ট করার জন্য 'ন্যারেটিভের যুদ্ধ' শুরু করা হয়। পাশাপাশি চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও বিভিন্ন কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সনাতনী পারিবারিক ও নৈতিক সংস্কৃতিকে ক্রমাগত অবক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শেষ ধাপ হিসেবে রাজপথের আন্দোলনকে অস্ত্র বানিয়ে সম্পূর্ণ শাসনযন্ত্রকে অচল করার চেষ্টা চলে।

ভারতীয় সংবিধানের মূল স্থপতি ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর গণপরিষদে দেওয়া তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে এই বিপদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিদেশি ব্রিটিশ শাসনামলে সংসদীয় বা বিচারবিভাগীয় প্রতিকার ছিল না বলেই সত্যাগ্রহ বা বিপ্লবী পথ হয়তো যুক্তিসঙ্গত ছিল; কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত গণতান্ত্রিক ভারতে এই ধরনের আন্দোলন সরাসরি 'নৈরাজ্যের ব্যাকরণ' বা 'Grammar of Anarchy'। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিকদের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, কারণ তাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে আস্থা নেই এবং তারা 'বিপ্লব'-এর নামে ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোকেই উৎখাত করতে চায়।

কাজেই এই ধরনের আন্দোলনকে কেবল কোনো একটি দলের রাজনৈতিক বিরোধিতা হিসেবে দেখলে মস্ত বড়ো ভুল হবে; এটি আসলে ভারতীয় সংবিধান ও জাতীয় সংহতির ওপর এক ভয়াবহ আক্রমণ। ডঃ আম্বেদকরের সতর্কবার্তাকে স্মরণে রেখে এই 'নৈরাজ্যের ব্যাকরণ' প্রতিরোধে সমগ্র সমাজকে জেগে উঠতে হবে। যুবশক্তির মাঝে লুকিয়ে থাকা অপরিসীম দেশপ্রেম, একতা এবং সেবার মানসিকতাকে জাগ্রত করে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনে তাদের নিয়োজিত করাই হবে একটি উন্নত ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পেশ হওয়ার পর গড়ে ওঠা ‘আন্দোলন’ আরশোলাদের চরিত্র সম্পূর্ণ উন্মোচন করেছে

সম্প্রতি নিট (ইউজি) প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসাত্মক আন্দোলন সংঘটিত করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। যে এডুকেশন বা কোচিং মাফিয়ারা নিট (ইউজি) প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে যুক্ত ছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ২০২৫ ও ’২৬— দু’বারের প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের অপরাধীদেরই ধরা হয়েছে। যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনেছে তাদেরও ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পরের বছর থেকে JEE-র মতো নিট (ইউজি)-র ক্ষেত্রেও অনলাইন পরীক্ষা হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আগে এই পরীক্ষা অনলাইনে হয়নি কেন? GRE, GMAT-তো বহু বছর ধরে অনলাইনে হতো। তাহলে সেই সময় JEE, নিট অনলাইন হয়নি কেন? WBJEE পরীক্ষা তো এখনও অনলাইনে হয় না এবং আল আমিন মিশন থেকে কোনো কোনো বছর ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এই বিষয়গুলি কিন্তু বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সিজেপি আন্দোলনের মূল দাবি ছিল— নিট (ইউজি) প্রশ্ন ফাঁসের দায়ভার নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। তাদের চরম অরাজক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত ২৫ জুলাই পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রশ্ন হলো— কোনো পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর কি পদত্যাগ করা উচিত? ভারতের সব রাজ্যের পুরসভা-পঞ্চায়েতে কিছু না কিছু দুর্নীতি রয়েছে। তার জন্য কি মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন? পার্থক্য হলো নিট (ইউজি) প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে কাউকে কিন্তু বাঁচানোর চেষ্টা করেননি ধর্মেন্দ্র প্রধান। গত ১৫ বছর ধরে ঠিক যে কাজটা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে। পোস্তা ব্রিজ কাণ্ডে তো ব্রিজের ডিজাইন হাপিশ করে দেওয়া হয়েছে যাতে তদন্ত না করা যায়। ২০২৫ সালে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি যায় ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর। কোনো অপরাধীকে বাঁচাতে তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে এরকম অসহযোগিতা কি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে? প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে আসায় সেই পরীক্ষাটি বাতিল হয়ে এবছরই নিট (ইউজি) পরীক্ষা দ্বিতীয়বার হয়। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন ছাত্র প্রথম স্থানাধিকার করে। এবার কেন্দ্র নিট (ইউজি) পরীক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা JEE-র মতো সাজাচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনামলে কী হয়েছে?

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে যখন দ্বিতীয়বার এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে, সেখানেও পরীক্ষায় পাশ করানোর ক্রাইটেরিয়া হিসেবে ঘুষ নেওয়াটা বাদ ছিল না। নিট (ইউজি) পরীক্ষায় দু’বার গণ্ডগোল হয় এবং বিষয়টি মেনে নেয় কেন্দ্র। আবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং শেষে সম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার কাজ চলছে। সেখানে এত প্রতিবাদ? এরাজ্যে ২০১১ থেকে ২০২৬— রাজ্য সরকার পরিচালিত কোনো পরীক্ষা যেখানে ঠিকভাবে হয়নি, রাজ্য সরকারি সিস্টেমের ওপর লোকজনের ভরসা উঠে যাওয়ায় সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া বিভিন্ন কোচিং ইনস্টিটিউট যখন প্রায় উঠে গিয়েছে— তখন কেন এ ধরনের কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি? সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এক্ষেত্রে পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

তিন বছর আগে সোনম ওয়াংচুক সস্ত্রীক দেখা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজীর সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক পরিচালনায় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়ার কারণে তাঁকে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে অভিহিতও করেন। এর মধ্যে এফসিআরএ আইনের প্রয়োগে বন্ধ হয় তাঁর দু’টি এনজিও। গত ২৫ মার্চ সংসদে ‘এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬’ পেশ হতেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন সোনম ভাই। বুঝতে পারেন এবার তাঁর আয়ের সব রাস্তা বন্ধ। সব ব্যবসা ও এনজিও তাঁকে বন্ধ করতে হবে। ব্যাস্! গত ২৮ জুন সিজেপি-র আন্দোলনে যোগ দিয়ে ধরনা মঞ্চে বসে শুরু করলেন অনশন। উদ্দেশ্য— নিট (ইউজি) প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদ, এর প্রতিকার-সহ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ও শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের দাবি। তার আন্দোলনের মাধ্যম হলো সিজেপি। তাঁর বক্তব্য— শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার চাই। কিন্তু বিকল্প কী? সেটা কেউ জানে না। অনেকেই ‘থ্রি ইডিয়টস্’ সিনেমাটি দেখেছেন। তাদের একাংশের মতে, লাদাখের সোনম ভাইয়ের ছায়ায় তৈরি হয়েছে উপরোক্ত সিনেমার রণছোড়দাস শ্যামলদাস চাঁচড় বা র‍্যাঞ্চো-র চরিত্রটি। অনেকের ধারণা শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার বলতে র‍্যাঞ্চো যেমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন, সোনম ভাই ওইরকম একটা করে স্কুল তৈরি করে দেবেন সারা ভারতে। এরকম অলীক ধারণার বিপ্রতীপে থাকা বাস্তবটা হলো— সিনেমার র‍্যাঞ্চো যেমন গরিবের সন্তান ছিলেন, সোনম ভাই কিন্তু তা নন। তাঁর পিতা একজন কোটিপতি বিধায়ক। সিনেমার র‍্যাঞ্চো-র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কয়েক’শো পেটেন্ট ছিল এবং সেই অর্থে তিনি তাঁর স্কুল চালাতেন। সোনম ভাইয়ের কিন্তু একটা পেটেন্টও নেই। তাঁর সংস্থা পরিচালিত হয় বিদেশি অনুদানে। এবার আসা যাক সোনম ভাই পরিচালিত পরিবেশ আন্দোলনে। জম্মু-কাশ্মীর পূর্ণাঙ্গ রাজ্য থাকাকালীন আবদুল্লা, মুফতিরা লাদাখের জন্য কিছুই বাজেট বরাদ্দ রাখত না। ২০১৯ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ জুড়ে জাতীয় সড়ক, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হোটেল, বিমানবন্দর, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানীয় জল প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ শুরু হতেই সমস্যা শুরু হয় চীনের, যারা মনে করে অরুণাচল প্রদেশের মতো লাদাখও তাদের অংশ। বিদেশি অঙ্গুলি হেলনে লাদাখে শুরু হয় ‘পরিবেশ বাঁচাও’ আন্দোলন। ১৯৩০-এর দশকের ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল অফ সোশিওলজি-র দিন থেকে কালচারাল মার্ক্সিস্টদের এটা একটা চাল। কোনো এলাকায় স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থ জড়িত থাকলে সেখানে উন্নয়নের গতিরোধে পরিবেশ আন্দোলন খাড়া করা হয়। লালচীন তিব্বতের খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ দেদার লুঠ করে চলেছে, তিব্বত জুড়ে গণহত্যা সংঘটিত করছে, তিব্বতের ডেমোগ্রাফি পালটে দিয়েছে— তা নিয়ে এই তথাকথিত মানবাধিকার বা পরিবেশরক্ষা আন্দোলনকর্মীদের কোনো প্রতিবাদ নেই, অথচ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলে সেটা দোষ? আবার কাজ না করলে তারাই বলবে— ‘অনুন্নয়ন’! ২০২৪ ও ’২৫ সালে লাদাখে সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হন সোনম ওয়াংচুক এবং ১৭০ দিন জেলবন্দি থাকার পর এবছর মার্চ মাসে মুক্তি পান। এরপর সংসদে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পেশ হওয়ায় ফের জড়িয়ে পড়েন আরশোলাদের নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনে। □

বিদেশি অনুদান সংশোধনী বিল ২০২৬

সার্বভৌমত্বের পাঁচিল

ডঃ রাজলক্ষ্মী বসু

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'ন্যাশনাল কালেকটিভ' শব্দবন্ধ তার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়াচ্ছে। যে শব্দ সেইসব 'আমাদের' এবং 'না-আমাদের' পৃথক করে অন্তত চিহ্নিত করে। চাল ডাল পৃথক করার মতো কাজ খানিকটা। সবাই থাকবে কিন্তু সঠিক পথে সঠিক পন্থাতে থাকবে। ন্যাশনাল কালেকটিভ কিন্তু কোনো যুক্তিতে অগণতান্ত্রিক নয়। সার্বভৌমত্বরোধী নয়। বরং তা পরিচিতিবোধ, হিসেববোধকে আরও পোক্ত করে দেশের সার্বভৌমত্বের বুনট জোরালো করে। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে— FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) বা চলতি সহজ কথায় বিদেশি অনুদানের পথ, গতিবিধি বিষয়ে আরও একটু বাঁধন দরকার। তা কি আদৌ সার্বভৌমত্ব বিরোধী? তা কি আদৌ কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানবে? তা কি কোনোভাবে সামাজিক, সেবামূলক, পারস্পরিক বান্ধবমূলক বিনিময়, যোগাযোগ, আদান- প্রদান অনুদানে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে!

আবারও উত্তাল ভারতের সংসদ। আবারও আপাত স্থগিত এই এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল ২০২৬, যা বিগত সময়েও বহুবার সংশোধিত- পরিবর্তিত-পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট— বিলটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলানোর জন্য যথেষ্ট যোগ্য। বিশ্বায়নের বলে আমাদের অনেক নিয়ম, আন্তর্জাতিক লেনদেন বদলেছে। ক্রিপটো কারেনসির ফলে লেন-দেনে জটিল অবৈধতা বেড়েছে। আরব দেশের হাওয়ালা টাকা দেশে দেশে অন্ধকার কাজের গতি বাড়াতে মরিয়া। আন্তর্জাতিক চক্র অনেক সময়ই সমাজসেবার আড়ালে, দেশের নরম কূটনীতির ফাঁকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ফাঁদ পাতে। তা নতুন নামও পেয়েছে। যেমন— ডিপ স্টেট, শ্যাডো এনিমি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হলো— বিদেশি অনুদান বিলে কেন এতো আপত্তি? এই সংশোধিত বিল ২০২৬ প্রস্তাবে কোথাও উল্লেখ নেই— অর্থ অনুদান নেওয়াতে কোনো বাধা আছে। যে কোনো সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যে কেউই অনুদান গ্রহণ করতে পারবেন, যেমন আগেও হচ্ছিল। সমস্যা আনল তিনটি বিন্দু। Transparency (স্বচ্ছতা), Accountability (দায়বদ্ধতা), Sovereignty (সার্বভৌমত্ব) —এই তিনটিই বারংবার একাধিক স্থলে লঙ্ঘিত। রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ হয় না বছরের পর বছর, অথচ সেই সংস্থা বিদেশি অনুদান নিয়েই চলেছে। বিদেশি অর্থ নিচ্ছে কিন্তু তার অডিট হয় না বছরের পর বছর। বিদেশি অর্থ আসছে এক কাজের জন্য ব্যবহার হচ্ছে ভিন্ন কাজে। সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য টাকা এল, তারপর তা প্রান্তিক মানুষের হাতে ধরিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করে ধর্মান্তরিত করা... লাখে একটা উদাহরণ নয় কিন্তু! লক্ষ লক্ষ উদাহরণ আছে দেশজুড়ে। তাতে তালা দিতে চাইলে তা কি গণতন্ত্রে আঘাত নাকি কারোর ধর্মাচরণে বজ্রআঁটুনি। অসৎ উদ্দেশ্যে যখনই বেড়া পরে তখনই একটা শোরগোল হয়। প্রথম যে শোরগোল হচ্ছে তা হলো Single Verification Entry Point বিষয়ে। যতো বিদেশি অনুদান তা প্রথমে গৃহীত হবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার দিল্লি মুখ্য শাখায়। তারপর তা কার্যকরী কেন্দ্রের ব্যাংক শাখায় প্রেরণ হবে। এবং বলা আছে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে অর্থ গ্রহণ করবে তার ২০ শতাংশ তাদের অফিস ব্যয়ে এবং বাকিটা অতি অবশ্যই আসল জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে। এই বিল নিয়ে বিরক্তির আরও একটা বড়ো কারণ, যদি যথাযথ বৈধ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন নবীকরণ না হয় তখন সরকার তার ক্ষমতাবলে তা অধিগ্রহণ করবে। যে কংগ্রেস আজ এই বিলের তীব্র বিরোধ করছে, তাদের আমলেই যখন ২০১০-এ বিলটি সংশোধিত হয় তখন বিলের ধারা ১৫-র বলে অন্ততপক্ষে ২০ হাজার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছিল।

এছাড়াও কমকরে ১৫ হাজার অমীমাংসিত মামলা রইল যাদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এখন আইনের জাঁতাকলে পড়ে। অর্থাৎ অনুদান মানেই তাতে স্পষ্টতার অভাব। বিদেশি অনুদান, টাকা তছনছ হলে কিছুই বলার নেই, কিন্তু টাকার অপব্যবহার মানে তা সার্বভৌমত্ব বিরোধিতা, তা অন্য দেশের প্রভাবে এক শ্রেণীর মানুষকে কলের পুতুল বানিয়ে আমাদের দেশের মধ্যে ঘুণপোকার মতো ব্যবহার করা। তা মিথ্যার রক্তবীজ। তা কখনো কখনো মোল্লাবাদের মুখোশ পরিহিত অপরাধের শাখা বিস্তার, কখনো আবার সমাজ সেবার আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারির ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্র। যেকোনো বাস্তুতন্ত্রেই আঘাত আসলে তাতে ভয়ানক আলোড়ন তৈরি হয়। যদি তা অর্থ বাস্তুতন্ত্র হয়, তখন আর রক্ষে নেই। বিদেশি অনুদান সংশোধনী বিল, ২০২৬ সেই ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্র বাস্তুতন্ত্রেই ঢিল ফেলেছে। বিশ্ব ব্যাপী যতো উন্নত দেশ আছে প্রত্যেকেই বিদেশি অনুদান বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২০২৪-২৫-এ ইউরোব্যারোমিটার নামক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৮১ শতাংশ ইউরোপিয়ান বিদেশি অর্থ অনুদানের বিরোধিতা করছে। মজার কথা, ওরাই আবার ভারতে 'সমাজ সেবার' জন্য যখন চার্চে অর্থ প্রদান করে তখন তা হয়ে যায় ইতিবাচক!

সমস্যাটা হলো চার্চ বা অনেক খ্রিস্টান সংস্থা তা স্কুল, চিকিৎসা, শিশু উন্নতিকল্পে ব্যবহার না করে জনজাতি, বনবাসী মানুষদের ধরে ধরে ধর্মান্তরিত করে। এই সংশোধিত বিলে— স্পষ্ট বলা আছে বিদেশি অনুদান ধর্মান্তরণে ব্যবহার করা যাবে না। ধর্ম প্রচার, চার্চ গঠন আর অভাবী মানুষের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করা এক বিষয় নয়। আসল জায়গাতেই ঢিল পড়েছে তাই আমেরিকার থেকেও এই বিলের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান রিলে মুর যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ, গত ৪ আগস্ট এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বসলেন— এই বিল সরাসরি খ্রিস্টানদের উপর আঘাত। এমনকী হুমকি দিয়ে লিখলেন— এই বিল ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কেও চিড় ধরাবে। ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব চার্চ (ইন্ডিয়া)

ফঃ ২

ওই রিপাবলিকান ব্যক্তির কথায় উচ্ছ্বসিত। ভারতবর্ষ একটা বোধের নাম, অখণ্ডতার ঠিকানা। এই বিল আপাতত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে জমা আছে। এমন ব্যাখ্যা ভুল, আমেরিকার কোনো এক রিপাবলিকান নেতার হুমকিতে আপাত থামা। থামা, আবারও খতিয়ে দেখার জন্য যেন কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে বিন্দুমাত্র আঘাত অসম্মান না আসে।

জ্ঞানে-অজ্ঞানে রাজনৈতিক ভাষ্যে অনেক অসংলগ্ন ভাষা, অনেক সময়ই বিদ্বেষী মন্তব্য ব্যবহার হয়। বিষয়টা যখন বিল সংশোধন, তখন তাতে হাজার বিবেচনা, বিরোধিতার থেকেও বিষয়বিন্দু সংগ্রহ, সংযোজন, পরিবর্তন ইত্যাদি থাকে। সময় লাগা মানে তাকে স্পর্শকাতর ভাবেই দেখা হচ্ছে। আসলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে--- বিজয় লালকে। যিনি ইভানজেলিক্যাল ফেলোশিপ অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন— বিষয়টিকে আরও পর্যালোচনা করতে হবে। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ের মতো খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাতো এনডিএ-শরিক। তাঁরাও বলেছেন বিলটিকে আরও পর্যালোচনার। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে যে খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু তাঁদের প্রতিষ্ঠান বা উপাসনা পদ্ধতিগতঅভ্যাসে কোনো নিয়ন্ত্রণ, নাক গলানোর বিষয়টাই এই বিলে কোথাও নেই। যারা ফান্ড স্বচ্ছতার বিন্দু শুনলেই তেলেবেগুনে হচ্ছেন তাঁদের দশা অনেকটা 'ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি' গোছের।

বিদেশি অর্থ অনুদান এবং সংবাদ মাধ্যমের উপর প্রভাব, ভোটের উপর প্রভাব, বিমর্শ গঠনে প্রভাব— নিশ্চিত ভাবেই সার্বভৌমত্ব প্রভাব রাখে। ওসিসিআরবি-এর মতো অনেক তদন্তমূলক আন্তর্জাতিক সংবাদ চক্র আছে যারা বিদেশি অনুদানে চলে। একটা সময় যেমন নিউজ ক্লিক-এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আওয়াজ ওঠেছিল— ওরা চীনের টাকায় পুষ্ট। চাইনিজ প্রোপাগান্ডা সংবাদ পরিবেশন আমাদের দেশে চলেছে, আগামীতেও চলবে যদি না বিদেশি অনুদানের হিসেব, ব্যয়ের ধারা, মাত্রা স্পষ্ট হয়। হিসেবহীন বিদেশি অনুদান অনেকটা ট্রোজান হর্স মডেল। এ এক অদ্ভুত বিনিয়োগ, যেখানে প্রথমে বোঝানো হয় দেশটা ঠিকঠাক নয়। তারপর আসে টাকা। তারপর দেশীয় ব্যবস্থার উপর, নীতির উপর তারা অদৃশ্য নির্ধারক শক্তি হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত বিশ্বায়নটাও যেমন ট্রোজান হর্স মডেল, অতিরিক্ত বিদেশি বিনিয়োগটাও তাই আবার হিসাবহীন, বিদেশি অনুদানটাও একইরকম।

মৌলিক অধিকার?

এবার তর্ক যুক্তি আসতেই পারে বিদেশি অনুদান গ্রহণ আমাদের মৌলিক অধিকার। ২০২০-র এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল যখন ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালতে গেল তখন কেন্দ্রীয় সরকার মহামান্য শীর্ষ আদালতকে বলছে— Forgein money does not dominate public life as well as political and social discourse in India... হলফনামায় সেদিন লেখা ছিল— NGOs had no fundamental right to receive foreign donations. এবং আবারও মনে রাখতে হবে এই সংশোধিত বিলের ফলেও ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ২১, ১৯(১) (সি), এবং অনুচ্ছেদ ১৯(১)(জি) কোনোভাবেই আক্রান্ত হচ্ছে না। তবে কোন যুক্তিতে মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে?

বরং ধর্মান্তরিত করাটাই মৌলিক অধিকার নষ্ট। উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে গত বছর ডিসেম্বরে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আসে তাতে দেখা যায় রোজাখানা অঞ্চলেই কম করে ৪ কোটি টাকা বিদেশি অনুদান ব্যবহার হচ্ছে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান তৈরিতে। অনুদান নিয়ে সেবার আড়ালে এই ধরনের জঘন্য কাজ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ১৩১, ১৯৭, ৩৫২, ৩৫১(৩)-এর আওতাভুক্ত। যা ক্ষমা অযোগ্য অপরাধ। শুধু কি এমন উদাহরণেই শেষ, কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি) গত ২৯ এপ্রিল ভারতের মধ্যে মার্কিন দেশ ডেবিট কার্ড লেন-দেনের হদিস পায় যেখানে আনুমানিক ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এটিএম মারফত তোলা হয়েছে এবং যে ফান্ডের অধিকাংশটাই ব্যবহার হয়েছে ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের জনজাতি অঞ্চলে। বস্তার, ধামতাড়ি অঞ্চলেই ৬৮৫,০০০ ডলার আসে The Timothy Initiative (TTI)-এর মাধ্যমে, যারা বিশ্বব্যাপী evangelical মিশনারি প্রচার করে।

এখনই ভারতের অনেকে বলবেন— এই বিল খ্রিস্টানদের দমাচ্ছে। যদি TTI-এর উদাহরণটাই নিই, এটি এখনও পর্যন্ত ভারতে সেবা করার জন্য রেজিস্ট্রেশনটাই করেনি, ভারতে এরা ফান্ড আনে কোন বলে কোন যুক্তিতে! আবার লক্ষ্য করি, ঠিক যেখানে ডানা ছাঁটা মাওবাদীদের ডেরা সেখানেই আসতে হলো TTI-কে। এটার ব্যাখ্যা কী হবে— মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন নাকি সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন! এক বাক্যে বললে ২০২৬ সংশোধিত বিল TTI-দের মতো সবার ধূর্তামিতে বেড়া বাঁধবে।

২০২২-এ এত গুরুত্বপূর্ণ মামলা হয়, Noel Harper Vs. Union of India। মহামান্য শীর্ষ আদালতের এএম খানউইলকার, দীনেশ মহেশ্বরী, রবিকুমারের বেঞ্চ স্পষ্ট করে বললেন— 'Foreign Contribution can have material impact in the matter of socio-economic structure and polity of the country...the presence/inflow of foreign contribution in the country to be at the minimum level, if not completely eschewed. The influence may manifest in different ways, including in destabilising the social order within the country.'

'শেষ বাক্যটাই লাখ কথার এক কথা— ভারতকে destabilise যেন কোনো বিদেশি রসদ করতে না পারে তার দিকে নজর রাখাটাই বরং আমাদের মৌলিক কর্তব্য। বিরোধিতা আছে থাকবে, কক্ষ চলে বিরোধীদের জন্য। এটাই গণতন্ত্রের জোর, এটাই সংসদ কক্ষের ঐতিহ্য। বিলটি আপাতত পুনর্বিবেচনার জন্য। বিরোধী পক্ষ ভোট নাও দেয়, তাহলেও আশা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ এই বিলটি উত্তীর্ণ হবে। কারণ এনডিএ জোট শরিক হিসেবে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই) যোগদান করেছেন ২০ জন সাংসদ। কেউ কেউ চূড়ান্ত হিন্দু বিদ্বেষী সাংসদ হলেও যেহেতু তাঁরা এই মুহূর্তে এনডিএ জোট শরিক তাই অনুমেয় তাঁরা সবাই এই বিলের সমর্থন করবেন। অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্যেও সাংসদদের এনডিএ ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়ছে। ফলে, বিলটি বিলম্বে হলেও আশা করা যায় উত্তীর্ণ হবে।

যেটা বলে শুরু করেছিলাম— 'ন্যাশনাল কালেকটিভ'— এই বিল তারই প্রয়োগ, তারই প্রয়োজন। অবাক হবো না যদি দেখি এনডিএ শরিক, বিজেপির সমষ্টিগত সাংসদ সংখ্যার চাইতেও যদি দু-একটা ভোট বাড়তি আসে। বিলটি যে তাৎপর্য রাখে তা আর তখন ব্যাখ্যা করার দরকার হবে না।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ কবে বন্ধ হবে?

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

হিন্দুদের রক্ত আর কত বয়ে গেলে বাংলাদেশের জেহাদি মুসলমানরা শান্ত হবে? প্রশ্নটা দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিকদের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগকে শুধু সাম্প্রতিক কয়েক বছরের ঘটনাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখলে এর পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বোঝা যাবে না। নোয়াখালীর হিন্দুহত্যা ও দেশভাগ হতে শুরু করে কত রক্ত সে দেশে বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গে প্রাণের বিনাশ। হিন্দুদের কান্নায় সে দেশের আকাশ ভারী হয়ে আছে। বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে হিন্দু সমাজের উপস্থিতি বহু শতাব্দীর পুরোনো এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও তারা এই অঞ্চলের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিল। ব্রিটিশ ভারতের ১৯০১ সালের জনগণনাতে পূর্ববঙ্গের ভূখণ্ডে হিন্দুদের অনুপাত ছিল প্রায় ৩৩ শতাংশ; ১৯৪১ সালে তা নেমে হয় ২৮ শতাংশ। পরবর্তী দশকগুলোতে এই অনুপাত ধারাবাহিকভাবে কমতে শুরু করে— ১৯৫১ সালে ২২ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ১৮.৫ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ১৩.৫ শতাংশ সবশেষে তা নেমে আসে ৮ শতাংশে। প্রকৃতপক্ষে সেটি আরও কম হবে বলে অনেকে মনে করছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যানের ঐতিহাসিক সারণিতেও এই পরিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এই জনমিতিক পরিবর্তনের পেছনে একক কোনো কারণ ছিল না। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, সম্পত্তি হারানো, রাজনৈতিক বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা এবং ভারত- পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক উত্তেজনা— সবগুলো বিষয়ই বিভিন্ন সময়ে এক্ষেত্রে রক্তাক্ত ভূমিকা রেখেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ছিল এই ইতিহাসের একটি বড়ো মোড়। বঙ্গ বিভাগ হয়ে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। দেশভাগের সময় জেহাদি আক্রমণ ও অনিরাপত্তার কারণে পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক হিন্দুর স্থানান্তর ঘটে। ফলে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও জনমিতিক কাঠামোতে বড়ো পরিবর্তন আসে।

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের জেহাদি আক্রমণ এই নিরাপত্তাহীনতার ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ওপর একচেটিয়া হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও জোরপূর্বক বিতাড়নের অভিযোগ ওঠে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই ধারাবাহিকতা আজকেও থেমে নেই। তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে পাঠানো একাধিক বার্তায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের দুর্দশা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, ফল কিছুই হয়নি। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশই নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেটি পাকিস্তানে বাস্তবতার আলো দেখেনি। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা যে সরকারের মৌলিক দায়িত্ব— এই নীতিটি তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি কাগজেই স্থান পেয়েছিল।

> **বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিশ্রুতি তখনই বাস্তব অর্থ পাবে, যখন একজন হিন্দু নাগরিক রাতেরবেলা নিজের বাড়িতে নিরাপদ বোধ করবেন, নিজের মন্দিরে নির্ভয়ে ধর্মাচরণ করতে পারবেন, নিজের সম্পত্তির ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারবেন।**

পরবর্তীতে হিন্দুদের সম্পত্তি ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে হিন্দু সম্পত্তিকে Enemy Property হিসেবে দেখা হতো যার আওতায় হিন্দুদের পাকিস্তানে 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের সম্পত্তি দেশের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পথ সুগম করে। ফলে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে পরবর্তীকালে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ব্যবস্থার প্রয়োগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু মালিকানাধীন সম্পত্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর এর উত্তরাধিকার ভেস্টেড প্রপার্টি ব্যবস্থার মধ্যেও থেকে যায়। শুধুই একটা শব্দের পরিবর্তন হয়েছিল সেদিন। কার্যত কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এই ইতিহাসে আরেকটি গভীর অধ্যায় রচিত হয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের আক্রমণে হিন্দু জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। যদিও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ধর্ম, সম্প্রদায় ও পরিচয়ের ঊর্ধ্বে নাগরিকের সমঅধিকার। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয় জীবনের অন্যতম মৌলিক নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহার এবং ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক কাঠামোতে আবার পরিবর্তন আসে। ১৯৮৮ সালে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলা হলেও একই সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের সমান

মর্যাদা ও ধর্ম পালনের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবার সংবিধানের মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই দীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিকে বিচার করলে হিন্দু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠনের প্রতিবেদনে হিন্দুদের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ ও ধর্মীয় বিদ্বেষের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলা হয়েছে। ২৮(১) অনুচ্ছেদে ধর্মের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ৪১ অনুচ্ছেদে ধর্ম পালন, প্রচার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ একজন হিন্দু নাগরিকের নিজের ধর্ম পালন, মন্দিরে যাওয়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা, সম্পত্তি রাখা ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যেই সুরক্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তর ২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে করা প্রাথমিক বিশ্লেষণে জানায়, ৫ ও ৬ আগস্ট অন্তত ২৭টি জেলায় হিন্দুদের বাড়িঘর ও সম্পত্তিতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের খবর পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকটি উপাসনালয়ও আক্রান্ত হয়; মেহেরপুরের একটি ইসকন মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২৫ সালেও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ অব্যাহত থাকার কথা বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তারা প্রতিটি ঘটনার স্বাধীন, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ২৫৭টি আক্রমণের ঘটনা ও ৪৪ জন নিহতের কথা উল্লেখ করেছিল। একইভাবে সরকারের ২০২৫ সালের ৬৪৫টি সংখ্যালঘু-সম্পর্কিত ঘটনার মধ্যে ৭১টিতে সাম্প্রদায়িক উপাদান পাওয়ার দাবি এবং সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর ভিন্ন হিসাব— দুটিই পাশাপাশি রেখে তদন্ত ও তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছিল। ধর্মীয় পরিচয়ের আড়ালে সংঘটিত জেহাদি আক্রমণ 'সাধারণ অপরাধ' বলে উপেক্ষা করার কারণে এর মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বহু মানুষ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে অবস্থান নিলেও অনেক সময় তাদেরকে মৌন থাকতে দেখা যায়। কোনো হিন্দু নাগরিক যদি তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হামলার শিকার হন, তাঁর বাড়ি বা দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়, মন্দির ভাঙচুর করা হয়, অথবা তাঁকে ধর্ম পালনে ভয় দেখানো হয়, তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে গুরুতর মানবাধিকার, নাগরিক নিরাপত্তা এবং আইনের শাসনের প্রশ্ন। সরকারের দায়িত্ব শুধু ঘটনার পরে মামলা করা নয়; নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা। যা বাংলাদেশ আজও পারেনি।

শত বছরের ইতিহাস আমাদের একটি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখায়— সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দুর্বল হলে তার প্রভাব শুধু একটি সম্প্রদায়ের ওপর পড়ে না; দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন এবং সামাজিক আস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫০ সালের সংকটের পর যেমন দুই দেশের সরকারকে সংখ্যালঘুদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়েছিল, তেমনি আজও প্রয়োজন দৃশ্যমান ও বিশ্বাসযোগ্য সরকারি ব্যবস্থা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিচারহীনতার মানসিকতা বন্ধ করা। হামলার শিকার পরিবার যদি দেখতে পায় যে অপরাধীরা রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়বে। বিপরীতে দ্রুত তদন্ত, নিরপেক্ষ মামলা, দৃশ্যমান বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে সরকারের ওপর আস্থা পুনর্গঠিত হতে পারতো।

বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নটি তাই কোনো একটি সমাজের বিরুদ্ধে আরেকটি সম্প্রদায়ের অবস্থান নেওয়ার বিষয় নয়। এটি সংবিধানের শাসন, আইনের সমতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নাগরিক নিরাপত্তার প্রশ্ন। একজন হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান নাগরিক যেমন বাংলাদেশের নাগরিক, তেমনি একজন মুসলমান নাগরিকও সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক। এই কারণে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের বর্তমান নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করতে হলে ১৯০১ সালের জনমিতিক বাস্তবতা থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৫০-এর জেহাদি আক্রমণ, পাকিস্তান আমলের সম্পত্তি-সংক্রান্ত বৈষম্য, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক আদর্শ এবং পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তন— এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষা হলো, কোনো নাগরিককে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করার সুযোগ তৈরি হলে শেষপর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো প্রশাসনিকব্যবস্থাই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

তাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন— হিন্দু নাগরিকদের ওপর ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণের অভিযোগকে কোনোভাবেই হালকা করে দেখা যাবে না। একই সঙ্গে প্রতিটি ঘটনার সত্যতা, উদ্দেশ্য ও দায় নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হলো অপরাধীর ধর্ম নয়, অপরাধের বিচার করা এবং প্রতিটি নাগরিককে তার ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সমান নিরাপত্তা ও মর্যাদা দেওয়া। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিশ্রুতি তখনই বাস্তব অর্থ পাবে, যখন একজন হিন্দু নাগরিক রাতেরবেলা নিজের বাড়িতে নিরাপদ বোধ করবেন, নিজের মন্দিরে নির্ভয়ে ধর্মাচরণ করতে পারবেন, নিজের সম্পত্তির ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারবেন এবং জানবেন— তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় হলে সরকার তাঁর পাশে দাঁড়াবে। এটাই হওয়া উচিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্বের প্রকৃত অর্থ। □

এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬

বিদেশি টাকার দালালদের বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত যুদ্ধ

দীপল বিশ্বাস

ভারত এখন আর সেই দুর্বল নরম-মানসিকতার ভারত নেই। বর্তমান ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। অতিমারী, যুদ্ধ পরিস্থিতি, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মহাসংকটের মধ্যেও উন্নত বিশ্বের বিস্ময়ের উদ্রেক করে ২০২৫ সালে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি হার ৭.৭ শতাংশ। অর্থাৎ শুধু মুখের কথা নয় ২০৪৭-এ 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যপূরণে অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে নতুন ভারত। আর ভারতের এই উত্থান দেখে বিশ্বের কিছু তথাকথিত বন্ধু দেশ, কিছু বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তি আর তাদের দেশীয় দালালদের ঘুম উড়ে গেছে। তাই তারা নতুন খেলা শুরু করেছে। যুদ্ধ নয়, বন্দুক নয়, এবারের অস্ত্র হলো এনজিও, মিডিয়া, বিচারবিভাগের একাংশ আর রাস্তার মব বা উন্মত্ত জনতা। এই ষড়যন্ত্র ভাঙার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে আনা হয়েছে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬। কড়া আইন আনার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের উদ্দেশ্য হলো— দেশে অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশি অর্থের প্রবাহে বাঁধ দেওয়া। 'সার্বভৌম দেশ' অর্থ হলো— দেশটির সরকারি নীতি সবরকম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত। বিদেশি অর্থে ভারত জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে তাতে বিঘ্নিত হবে ভারতের সার্বভৌমত্ব। এ কারণে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ প্রকৃতপক্ষে এমন একটি আইন যা ভারতের সার্বভৌমত্বের ঘোষণাপত্র।

ফ্রি-তে কিছু পাওয়া যায় না— ডলারের পেছনের খঞ্জর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে, 'গ্লোবাল ডিপস্টেটের অস্তিত্ব' রয়েছে। তারা বিভিন্ন দেশে সরকার ফেলে, সরকার বসায়। কোনো দেশের সরকার আন্তর্জাতিক গুপ্ত প্রশাসনের নীতি মানতে অস্বীকৃত হলে বিভিন্ন এজেন্সি ও ঢালাও অর্থের প্রয়োগে সেই দেশে কালার রেভোলিউশন, সামরিক অভ্যুত্থান, জেহাদি অভ্যুত্থান এই আন্তর্জাতিক প্রভুদের কাছে জলভাত। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ লুঠ, আকাশ,সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের দখলদারিতে কোনো সরকার বাধা সৃষ্টি করলে, সেই সরকারকে সরিয়ে পছন্দের তাঁবেদার সরকার বসিয়ে লুঠতন্ত্র বজায় রাখাটা এইসব এজেন্সির কাজ। যেখানে আমেরিকা-স্থিত গ্লোবাল ডিপস্টেটের স্বার্থ নেই, সেখানে 'গণতন্ত্র'-এর নামে তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। ভারতের ক্ষেত্রেও চলছে তাদের একই ছক। ২০১৪-র পর থেকে ভারতের উন্নয়নের রেখচিত্র যখন ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে, তখন হঠাৎ করে দেশের আনাচেকানাচে 'গণতান্ত্রিক অধিকার', 'পরিবেশ', 'ধর্ম', 'কৃষক', 'জাতিগত সংরক্ষণ', 'সংখ্যালঘু'-র নামে আগুন জ্বলছে রব। এগুলো কি এমনি এমনি হয়? হয় না। কারণ 'No donations come free'। বিদেশ থেকে আসা প্রতিটি ডলারের গায়ে শর্ত লেখা থাকে। সেই শর্ত হলো ভারতের উত্থানের গতিকে থামিয়ে দাও। কর্পোরেট দুনিয়ার প্রভুদের করায়ত্ত অধিকাংশ মিডিয়া হাউজ। তাদের কাছে— News is also a business। বিচারবিভাগ ও আমলাতন্ত্রের একাংশ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মিডিয়া হাউজ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল, মানবাধিকার কর্মী— সবাই বিদেশি প্রভুদের কেনা গোলাম হয়ে যায়। প্রস্তাবিত এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল এই গোলামির শিকল ভাঙবে। বৈদেশিক অনুদানের প্রতিটি পয়সার হিসাব চাইবে। কোথা থেকে অর্থ এল, কার পকেটে গেল, কোন আন্দোলনে খরচ হলো— সব এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নজরদারির আওতায় থাকবে।

চোখের সামনে রয়েছে বাংলাদেশের উদাহরণ। শ্রীলঙ্কা, নেপালেও একই স্ক্রিপ্ট। প্রথমে ছাত্র, তারপর মব (উন্মত্ত জনতা), তারপর সরকার ফেলে তাঁবেদার সরকার বসানোর চেষ্টা।

আপাতত ব্যর্থ হলেও একই স্ক্রিপ্ট এখন ভারতের জন্য লেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলির মদতে স্ক্রিপ্ট লেখকরা ভাবছেন যে, ভারতের ২২ কোটির একটি অংশকে মজহবের নামে উসকে দিয়ে দিল্লির বুকে ৫-১০ লাখ লোক নামিয়ে দিলেই খেলা শেষ! উদ্দেশ্য একটাই— 'রেজিম চেঞ্জ'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে ফেলে দিয়ে ভারতের ৮ শতাংশ গ্রোথের ইঞ্জিনে ব্রেক কষা।

Dimaagi Naxal : এরা হলো স্যুট-বুট পরা দেশদ্রোহী। জঙ্গলের মাওয়িস্ট সন্ত্রাসবাদীদের শেষ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পূর্বতন কোনো সরকার ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে জঙ্গুলে মাওবাদীদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে পারেনি। অক্ষত থেকে গিয়েছে 'রেড করিডোর'। গত ৩১ মার্চের মধ্যে লাল সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সফল হয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের অরণ্যাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে সশস্ত্র মাওবাদীদের। কিন্তু আসল শত্রু এখন জঙ্গলে নেই। তারা এখন এসি ঘরে বসে। গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী এদের ঠিক নামই দিয়েছেন— Dimaagi Naxal। 'নকশাল' কোনো দল বা নির্দিষ্ট সংগঠন নয়। এটা একটা মানসিকতা। এটা একটা ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। এই ধরনের ঘৃণ্য মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি কোনো বাম, অতিবাম বা মাওবাদী দলের সদস্য হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। এরা ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এরা থাকে কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোর্টে, ব্যুরোক্রেসিতে, নিউজরুমে, বলিউডে। বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' সিনেমায় এদেরই গল্প প্রদর্শিত হয়েছিল।

এরা হলো গিরগিটির মতো। বিভিন্ন রং, পরিচয় বদল করে প্রতিমুহূর্তে আবির্ভূত হয়। কখনো এরা নয়াদিল্লিতে সিএএ-র বিরোধিতার নামে শাহিন বাগ বসায়। কখনো খালিস্তানিদের হাত ধরে 'কৃষক আন্দোলন' করে, যেখানে প্রকাশ্যে সমর্থন জানায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। পঞ্জাব-হরিয়ানার কয়েকজন ধনী কৃষককে সামনে রেখে সারা দেশের কৃষকদের ভবিষ্যৎ বন্ধক রেখে পার্লামেন্টে পাশ হওয়া

কৃষি বিলকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কখনো ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতার নামে, কখনো অন্য কোনো ইস্যুতে এরা নৈরাজ্য তৈরি করে। এদের পেট থেকেই বের হয় ‘টুকরে-টুকরে গ্যাং’, যাদের মুখে মুখে ফেরে স্লোগান— ‘ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাআল্লাহ’, ‘হিন্দুয়োঁ কী কবর খোদেঙ্গে হিন্দুয়োঁ কী ধরতি পর’! তথাকথিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চিকেন নেককে ঘিরে ফেলে ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফতোয়া দেয় এদের নেতা উমর খালিদ, শার্জিল ইমাম। এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পাশ হওয়া আটকাতে নয়াদিল্লির আবির্ভূত হয় লালরঙা আরশোলা, যাদের একমাত্র লক্ষ্য চতুর্দিকে চরম অরাজকতা সৃষ্টি। আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার দাবিদার, আম আদমি পার্টির পূর্বতন নেতা, একদা সামাজিক মাধ্যমে ‘AAPtimist’ পরিচয়ে খ্যাত অভিজিৎ দিপকে হলো এই আরশোলাদের নেতা। তাদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে যোগেন্দ্র যাদবের মতো আন্দোলনজীবীরা মন্তব্য করে যে, এবার সরকার থেকে নয়, ‘রাস্তা’ থেকেই পরিচালিত হবে দেশ। সংসদ নয়, এবারক থেকে আইন তৈরি ও খারিজ করবে রাজপথের আন্দোলন! এহেন চরম অগণতান্ত্রিক শক্তি আবার তাদের আন্দোলনে সমবেত কণ্ঠে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে। বাবাসাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে তারা মাল্যদান করে। এসবের মাধ্যমে তাদের সব ভণ্ডামি ধরা পড়ে।

উন্নয়ন আটকাও মিশন— নিকোবর থেকে ব্যাঙ্গালোর : এদের সবচেয়ে বড়ো টার্গেট হলো ভারতের উন্নয়ন। কারণ উন্নয়ন হলেই বিনিয়োগ আসবে, চাকরি হবে, ভারত শক্তিশালী হবে। আর সেটা হতে দেওয়া যাবে না।

দেখা যাক নিকোবরের দিকে। ভারত সরকার ৭৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নিকোবরে গভীর সমুদ্র বন্দর, সামরিক নৌ-ঘাঁটি, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন প্রকল্প ও আধুনিক পর্যটন হাব বানাতে চাইছে। এটা শুধু সমুদ্র বন্দর নয়, এটা চীনের ‘স্ট্রিং অফ পার্লস্’-এর বিরুদ্ধে ভারতের জবাব, মালাক্কা প্রণালীর মুখে ভারতের নজরদারি। পরিবেশের সব ছাড়পত্র পাওয়ার পরেও কারা এর বিরোধিতা করছে? বাম আর কংগ্রেস। কেন? কারণ চীনের স্বার্থে আঘাত লাগবে, তাই বিদেশি টাকায় পরিবেশের দোহাই দিয়ে এই প্রকল্পকে আটকানোর চক্রান্ত চলছে। এই প্রকল্প বন্ধ করার লক্ষ্যে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছে স্বার্থান্বেষী মহল। তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে পরিবেশ ধ্বংসের অজুহাত।

১২ ডিসেম্বর, ২০২০-র ঘটনা। তাইওয়ানের কোম্পানি ‘উইস্ট্রন’ হলো আই ফোন নির্মাতা সংস্থা ‘অ্যাপল্’-এর কন্ট্র্যাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার। ব্যাঙ্গালোরের কাছে নরসাপুরায়, উইস্ট্রন-এর ১০,৫০০ কর্মীর কারখানা। চীন থেকে অ্যাপলের বিনিয়োগ সরে তখন ভারতে এসেছে। কর্মচারীদের বেতন দিতে ৪ দিন দেরি হওয়াতেই বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন পুরো কারখানা ভেঙে দিল। কয়েক’শো কোটি টাকা মূল্যের আই ফোন, মোবাইল ফোন তৈরির যন্ত্রপাতি তারা গুঁড়িয়ে দিল। উদ্দেশ্য কী? শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা? না। উদ্দেশ্য হলো বিশ্বকে বার্তা দেওয়া যে ‘ভারতে বিনিয়োগ করলে ভাঙচুর হবে’। যাতে অ্যাপল্ আবার চীনের কাছেই হাত জোড় করে। ভারত থেকে বিনিয়োগ তুলে নিয়ে চীনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় মূল চক্রী ধরা পড়ে। সে ছিল এক এসএফআই ছাত্রনেতা, নাম তার— শ্রীকান্ত। চীনা প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় ভারতের বামপন্থীরা কতখানি নিবেদিতপ্রাণ— ব্যাঙ্গালোরের ঘটনাটি হলো তারই প্রমাণ।

আর এটাই হলো নতুন অর্থনৈতিক জেহাদ। দেশের নানা প্রান্তে সরাসরি সশস্ত্র আক্রমণ নয়, দেশের উন্নয়নকেই গলা টিপে মেরে দেওয়া।

চার্চ, মসজিদ আর আইএসআই-এর টাকার খেলা : জনজাতি বা পরিবেশের নামে আন্দোলন হলেই দেখতে হবে এক পেছনে কারা সক্রিয় রয়েছে। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে কোনো চার্চ জড়িত। আবার সেই আন্দোলনের ফান্ডিং আসছে জর্জ সোরোস-এর কাছ থেকে। গ্লোবাল ডিপস্টেটের অংশ ইভাঞ্জেলিকাল শক্তির দ্বারা পরিচালিত চার্চ, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত মসজিদগুলো কোনো প্রার্থনার জায়গা নয়, এগুলি রাজনীতির অফিস। ইসলামি বিশ্বের পেট্রো ডলার ও হালাল অর্থনীতি থেকে সংগৃহীত অর্থ নানান মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়ে থাকে পাক সামরিক সংস্থা আইএসআই, জেহাদি নেতা জাকির নায়েকের সংস্থা। সেই টাকায় ভারত জুড়ে চলে ওয়াকফ-মাফিয়াদের রাজত্ব, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, মাদ্রাসা নেটওয়ার্ক, ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ, রাজনৈতিক নেতা, গুরুত্বপূর্ণ আমলা, সামরিক অফিসারদের হানি ট্র্যাপিং, গোরুপাচার, মাদক পাচার, জাল নোট পাচার, আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার ও ইসলামি সন্ত্রাসবাদ।

বিদেশি ইভাঞ্জেলিকাল মিশনারিদের টাকা ভারতে ঢুকে বিভিন্ন চার্চের দ্বারা ধর্মান্তরণের মাধ্যমে ভারতের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে বিষ ছড়ায়। পরিণামে মধ্য ভারতে সৃষ্টি হয় মাওবাদ, উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ।

এমতাবস্থায় দেশের ডিজিটাল বর্ডার গার্ডিং, ফাইনান্সিয়াল বর্ডার গার্ডিং যেকোনো সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাই সেই লক্ষ্যে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন আজ সময়ের দাবি।

এবার আপোশ নয়, দরকার প্রতিরোধ, পাল্টা আঘাত : বিশ্বের যারা নিজেদের ‘নিয়ন্তা’ ভাবে, তারা কখনোই চাইবে না ভারত মাথা তুলে দাঁড়াক। আপাতত তারা ভারতের সামনে বন্ধুর মুখোশ পরে আছে। কিন্তু ভেতরে তারা চায় ভারত আবার সেই ১৯৯১-এর ভিখারি ভারত হয়ে যাক। তাই তারা সরাসরি যুদ্ধ করবে না। প্রথাগত যুদ্ধ এড়িয়ে তারা ভারতের ঘরের লোকদের দিয়েই ভারতীয়দের মারবে। সমাজসেবার অন্তরালে এনজিও-র নামে, সিভিল সোসাইটি-র নামে, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার নামে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে। এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পাশ হলে তাদের এই খেলা অনেকটাই বন্ধ হবে। নির্দিষ্ট কোনো এনজিও-র বিরুদ্ধে নয় এই আইন নয়। এটা ভারতের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে একটি আইন। যারা সত্যিকারের সমাজসেবামূলক কাজ করেন, তাদের এই আইনে কোনো ভয় নেই। ভয় তাদের যারা বিদেশি ডলারে দেশ বিক্রি করে। আজ ভারতের সামনে দুটো রাস্তা। একটা হলো বাংলাদেশের রাস্তা— জেহাদি মবোক্রেসি, ধ্বংস, নিকষ কালো অন্ধকার। আরেকটা হলো বিকশিত ভারতের রাস্তা— শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, আত্মসম্মান।

প্রধানমন্ত্রী যে Dimaagi Naxal-দের চিহ্নিত করেছেন, এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ হলো তাদের বিরুদ্ধে প্রথম সার্জিকাল স্ট্রাইক। এবার আর পেছনে ফেরার জায়গা নেই। দেশের স্বার্থে, আগামী প্রজন্মের সার্বিক সুরক্ষার লক্ষ্যে এই যুদ্ধ ভারতীয়দের জিততেই হবে। □

এফসিআরএ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬ নিয়ে বিরোধীদের এত উষ্মা কেন?

“বিদেশি অনুদান গ্রহণের অধিকার থাকুক কিন্তু সেই অর্থের জবাবদিহিতা অবশ্যই ভারতের আইনেই নিশ্চিত হতে হবে। অর্থ আসতে পারে বিদেশ থেকে, কিন্তু তার হিসেবের খাতা খুলতে হবে ভারতের মাটিতেই।”

ডঃ তরুণ মজুমদার

একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রাণশক্তি শুধুমাত্র তার নাগরিক সমাজ দিয়েই গড়ে উঠে না, সেখানে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল কিংবা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। বিদেশি অনুদানও অনেক সময় সেই মানবিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু এখানেই একটি মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় বিদেশ থেকে আসা অর্থ কি শুধুই একটি অনুদান, নাকি তার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর স্বার্থও জড়িয়ে আছে?

একটি নদী যেমন দূরদেশ থেকে জল বয়ে এনে কোনো জনপদকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনই বিদেশি অর্থও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবকল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু নদীর জল যেমন বাঁধ, সেচব্যবস্থা ও জলনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত না হলে বন্যার কারণ হতে পারে, তেমনই বিপুল পরিমাণ বিদেশি অর্থের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন স্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা।

এই কারণেই Foreign Contribution (Regulation) Act বা FCRA-র কাঠামো ২০২৬ সালের প্রস্তাবিত Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill সেই কাঠামোকেই আরও সুসংহত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষত কোনো সংগঠনের FCRA registration বাতিল, Surrender, lapse বা renewal না হওয়ার পর বিদেশি অনুদান এবং সেই অর্থে তৈরি সম্পত্তির কী হবে? এই প্রশ্নের একটি স্পষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করাই এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

তাই এই বিলকে কেবল এনজিও-বিরোধী বা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আইন হিসেবে দেখলে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অদৃশ্য থেকে যায়। আসল প্রশ্ন হওয়া উচিত বিদেশি অর্থের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জাতীয় স্বার্থ ও জবাবদিহিতা কতটা নিশ্চিত করা হচ্ছে?

FCRA-এর উদ্দেশ্য বিদেশি অনুদান বন্ধ করা নয়। বরং বিদেশি অর্থ যেন বৈধ উৎস থেকে আসে, নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং তার হিসেব স্বচ্ছ থাকে, সেটিই এর মূল লক্ষ্য। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝার জন্য কয়েকটি পরিসংখ্যান যথেষ্ট। PRS Legislative Research-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১৩,৫২০টি সংগঠন প্রায় ৫৫,৭৪১ কোটি বিদেশি অনুদান পেয়েছিল। আবার ১৫ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত FCRA portal-এ ১৪, ৪৪৯টি অ্যাক্টিভ সার্টিফিকেট, ২২,৪৯৮টি cancelled certificate এবং ১৫,২১২টি deemed-expired certificate ছিল।

এই বিপুল অর্থপ্রবাহের সামনে সরকার যদি প্রশ্ন না করে,

তাহলে বরং সেটিই হবে অস্বাভাবিক। প্রশ্নগুলি খুবই সরল, বিদেশ থেকে আসা অর্থ কোথায় গেল? যে উদ্দেশ্যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যেই কি তা ব্যয় করা হয়েছে? যে সংগঠনের FCRA registration বাতিল হয়েছে, তার হাতে থাকা বিদেশি অর্থ এবং সেই অর্থে তৈরি সম্পত্তির দায়িত্ব কার হাতে বর্তাবে? কোনো প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ হয়ে গেলে বিদেশি অনুদানে তৈরি সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কী হবে? এই প্রশ্নগুলিকে উপেক্ষা করা অনেকটা হিসেবের খাতায় কয়েকটি পাতা ফাঁকা রেখে দেওয়ার মতো।

আজ হয়তো সমস্যা দেখা যাবে না, কিন্তু কাল সেই ফাঁকা জায়গায় আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার জন্ম হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

২০২৬ সালের প্রস্তাবিত অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মূল পরিবর্তন রেজিস্ট্রেশন শেষ হলে সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় Designated Authority-র ব্যবস্থা করা। কোনো সংগঠনের FCRA certificate যদি সরকার বাতিল করে, সংগঠন নিজে স্যারেন্ডার করে, নির্ধারিত সময়ে renewal-এর আবেদন না করে, অথবা renewal application প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে সেই সংগঠনটির FCRA status লোপ পাবে। এই অবস্থায় বিদেশি অনুদান এবং সেই অর্থ দিয়ে তৈরি সম্পত্তির কী হবে, তা নিয়ে একটি স্পষ্ট ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বিল সেই দায়িত্বের জন্য Designated Authority-এর ব্যবস্থা করতে চাইছে। একটি বাড়ির মালিকানা যেমন স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন, তেমনই বিদেশি অনুদানে তৈরি সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তার আইনি ও প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হওয়া অতি আবশ্যক। কারণ কোনো সম্পত্তিই তা দেশীয় অর্থেই তৈরি হোক বা বিদেশি অনুদানে, সেই সম্পত্তি কখনোই সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত নয় এবং এটাই বিলটির পক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি।

বিদেশি অনুদান যখন গ্রহণ করা হয়, তখন তার সঙ্গে একটি দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। সেই অর্থে যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি তৈরি হয়, তবে সম্পত্তিটির ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা থাকা স্বাভাবিক।

বর্তমান বিতর্কের অন্যতম উত্তপ্ত বিষয় রিলিজিয়াস প্রতিষ্ঠান ও চার্চের সম্পত্তি। কিছু Christian organisation এবং Church representatives আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে প্রস্তাবিত বিলের মাধ্যমে বিদেশি অনুদানে তৈরি চার্চ, স্কুল, হাসপাতাল বা অন্যান্য সম্পত্তির ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু বিলের প্রস্তাবিত বিধান বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ safeguard-এর কথা সামনে আসে। কোনো সম্পত্তি যদি place of worship হয়, তবে Designated Authority-কে তার ধর্মীয় চরিত্র বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ 'সরকার চার্চ দখল করবে'... এই সরলীকৃত বক্তব্য দিয়ে পুরো বিধানটির ব্যাখ্যা করা রাজনৈতিক অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি Regulation-কে Ownership বলে চালাতে চাইছে! ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত হয় বলে সরকার প্রতিটি ব্যাংকের মালিক নয়। স্কুলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে সরকার প্রতিটি স্কুলের মালিক নয়।

স্বাভাবিকভাবেই কোনো রিলিজিয়াস প্রতিষ্ঠানের বিদেশি অনুদানের ওপর regulatory oversight থাকা মানেই তার ধর্মীয় চরিত্র বা স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া নয়। তবে এই বিধান বাস্তবে কীভাবে প্রয়োগ হবে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই JPC-তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। Registration lapse এবং deliberate violation এক জিনিস নয়। FCRA registration একটি renewable regulatory status। কোনো সংগঠন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে renewal না করলে সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হতে পারে কিন্তু এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। ধরা যাক, একটি সৎ ও দীর্ঘদিনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিছক প্রশাসনিক ভুলে সময়মতো renewal করতে পারলো না। অন্যদিকে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে আইন এড়িয়ে বিদেশি অর্থ ব্যবহারের চেষ্টা করলো। এই দুই ঘটনাকে একই চোখে দেখা উচিত নয়।

তাই due process অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনের প্রয়োগে genuine administrative lapse এবং deliberate regulatory evasion-এর মধ্যে পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। এই জায়গাতেই JPC-এর scrutiny বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ধর্ম নয়, বিদেশি অর্থের regulation এই পার্থক্যটি বিরোধীদের বুঝতে হবে। বিরোধীদের মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত— অর্থটি কোথা থেকে এসেছে? কোন উদ্দেশ্যে এসেছে? কোথায় ব্যয় হয়েছে? আইন অনুযায়ী তার হিসেব রাখা হয়েছে কী না ইত্যাদি।

বিদেশি অর্থ কখনো কখনো শুধু অর্থ থাকে না; তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভূ-রাজনীতি এবং প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নও যুক্ত হতে পারে। কোনো বিদেশি ব্যক্তি foundation বা organisation যখন ভারতের কোনো প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থ প্রদান করে, তখন দেশের পক্ষে অন্তত এটুকু জানা প্রয়োজন যে এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ সার্বভৌম দেশেই কোনো না কোনোভাবে foreign funding ও cross-border financial flows নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের দরজা যেমন বিদেশি অতিথির জন্য খোলা থাকতে পারে, তেমনই দরজায় প্রহরী রাখাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিথিকে স্বাগত জানানো এবং প্রবেশের হিসেব রাখা--- এই দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয় একদমই নয়।

বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং কিছু ধর্মীয় সংগঠন বিলটিকে minority institutions-এর বিরুদ্ধে বলে সমালোচনা করছে। কিন্তু যদি একই FCRA compliance Hindu NGO, Muslim NGO, Muslim NGO, Christian NGO, Buddhist organisation এবং secular NGO সমার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে শুধু minority institution হওয়ার কারণে regulationটিকে discriminatory বলা একেবারেই অযৌক্তিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিদেশি অনুদান গ্রহণের অধিকার থাকুক কিন্তু সেই অর্থের জবাবদিহিতা অবশ্যই ভারতের আইনেই নিশ্চিত হতে হবে। অর্থ অসতে পারে বিদেশ থেকে, কিন্তু তার হিসেবের খাতা খুলতে হবে ভারতের মাটিতেই। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকেও বুঝতে হবে বিরোধিতার জন্যই বিরোধ নয় বরং দেশবাসী তাদের থেকে গঠনমূলক বিরোধিতা প্রত্যাশা করে। প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মহাবেষ্টনে গড়ে ওঠা আমাদের এই উপমহাদেশীয় অনুপম সংস্কৃতি যেন বজায় থাকে এবং তার জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। □

কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোট

দুর্গাপূজার পরে সীমানা পুনর্বিন্যাস করে নতুন ওয়ার্ড সংখ্যার ভিত্তিতে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন করতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল। বিগত দুই সরকারও (বাম ও তৃণমূল) বিষয়টি-তে গুরুত্ব দেয়নি, নজরও দেয়নি। সীমানা পুনর্বিন্যাসের পরে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যায় সমতা এসেছে। এর ফলে পুরসভার পক্ষ থেকে পরিষেবা দেওয়া সুগম হবে। নবনির্বাচিত সরকার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এরকম একটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া সমাধা করে ফেলল, এজন্য তাদের সাধুবাদ প্রাপ্য। সদিচ্ছা থাকলে যে কোনো প্রশাসনিক কাজের বাস্তবায়নে কোনো অন্তরায় হয় না, উপরের ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রসঙ্গত, যে সময় (নভেম্বর মাস) রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট করতে মনস্থ করেছে, সেই সময় নির্বাচন হলে কিছু বাস্তব অসুবিধা আছে। প্রথমত, পুরভোট করার আগে ভোটার তালিকা পরিমার্জন করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে সর্বশেষ ভোটার তালিকা পরিমার্জন করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে সর্বশেষ ভোটার তালিকা নিয়ে তার ভিত্তিতে রাজ্যের তালিকা 'আপডেট' করার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। এই প্রক্রিয়া সময়-সাপেক্ষ। এরপর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রস্তাব ও আপত্তি জানানোর পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরে নভেম্বর মাস নির্বাচনের পক্ষে অনুকূল নয়। কেননা পুরো নভেম্বর মাস জুড়েই রয়েছে উৎসবের সমারোহ। যেমন— ধনতেরাস, কালীপূজা, দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ছট্‌পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসপূর্ণিমা, গুরু নানকের জন্মদিন। আর যেহেতু পুরভোট কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে, পুলিশ প্রশাসনও উপরোক্ত উৎসবের মরশুমে ব্যস্ত থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষেও নির্বাচনী প্রচারে অসুবিধা হবে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আমার মনে হয় নভেম্বর মাসে পুরভোট না করে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় রবিবার করাটাই সমীচীন হবে। বর্তমানে কলকাতা ও হাওড়া--- উভয় পুরসভাতেই প্রশাসক নিযুক্ত আছেন। পুরভোট বিলম্বিত হলে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় বিঘ্ন হবে না বা কোনো সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হবে না।

উপরোক্ত বিষয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—সপ্তর্ষি ঘোষ,
৫৭, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৯।

বিদেশিনী সোনিয়া কি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মর্মার্থ জানেন?

না, জানেন না— জানতে পারেন না। যে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামী রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার মাত্র কয়েকদিন আগেও এক চিঠিতে তাঁর স্বামীকে লিখেছিলেন— 'তোমার ভারত', অর্থাৎ হবু প্রধানমন্ত্রীর-স্ত্রী তখনও নিজেকে ভারতবাসী বলে ভাবতেই পারেননি— তিনি কী করে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মর্মার্থ জানবেন? আর তস্য পুত্র মিনি বিদেশে গিয়ে বিদেশিদের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং সাংবাদিক বৈঠকে প্রায় সর্বদা ভারতীয় রাজনীতিবিদদের নিন্দা-মন্দ করতেই ব্যস্ত থাকেন, যিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকেও মাঝে মাঝেই কাউকে কিছু না বলে বেপাত্তা হয়ে যান, তার পক্ষে দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মূল্য কতটুকু হতে পারে?

যে কালজয়ী সঙ্গীত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হৃদয়কে মৃত্যুভয়হীন করে তুলতো, যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ফাঁসির মঞ্চেও বিপ্লবীদের মৃত্যুভয়হীন করে তুলতো, যে ধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস আজও মুখরিত হয়, যে ধ্বনি এখনো প্রতিটি দেশপ্রেমিকের দেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বলে ভাবতে শেখায়, সেই সঙ্গীত সোনিয়াজী-রাহুলজীদের কি কখনো আনন্দ দান করতে পারে?

—বিনয়কৃষ্ণ দাশ,
উত্তমাশা, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

১৫ নয়, ১৮ আগস্ট বনগাঁর স্বাধীনতা দিবস

সারা ভারত যখন ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার উৎসবে মেতে ওঠে, তখন সীমান্তের শহর বনগাঁর আকাশে তখনো ছিল অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হলেও বনগাঁর মানুষের ভাগ্য তখনো নির্ধারিত হয়নি। তৎকালীন যশোর জেলার অন্তর্গত বনগাঁ মহকুমা প্রথমে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরে র‍্যাডক্লিফ সীমারেখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের পর বনগাঁ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতীয় তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বনগাঁবাসী কার্যত ভারতের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতার ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেন। এই কারণেই ১৮ আগস্ট শুধু একটি তারিখ নয়--- বনগাঁর মানুষের কাছে এটি আত্মপরিচয়, অস্তিত্ব, মাতৃভূমি এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে ঐতিহাসিক সংযুক্তির দিন। আজও এই দিনটিকে ঘিরে বনগাঁ জুড়ে আবেগ ও রাষ্ট্রবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে।

'বনগাঁ পাকিস্তানে যাবে'--- এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল হিন্দু জনমানসে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় সীমান্ত নির্ধারণকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা

ফঃ ৩

তৈরি হয়েছিল, তার গভীর অভিঘাত পড়েছিল বনগাঁয়। ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও বনগাঁর মানুষ জানতে পারেননি তাঁদের ভবিষ্যৎ কার সঙ্গে যুক্ত হবে। তিনদিন পর র‌্যাডক্লিফ সংশোধিত হয়ে সেই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে এবং বনগাঁ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্থানীয় ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণে উঠে আসে, ১৮ আগস্ট প্রথমবার বনগাঁয় ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই স্মৃতিই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ১৮ আগস্টকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— অখণ্ড বঙ্গের প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম বঙ্গভাগের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা আজও আলোচিত। বঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলকে ভারতের সঙ্গে রাখার দাবিতে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন দেশভাগের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। সমকালীন স্মৃতিচারণ ও গবেষণামূলক বিবরণে দেখা যায়, বঙ্গের বিভাজন এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে তিনি সক্রিয়ভাবে জনমত গড়ে তুলেছিলেন।

বনগাঁর ১৮ আগস্টের ইতিহাসকে তাই শুধু একটি প্রশাসনিক মানচিত্র পরিবর্তনের ঘটনা হিসেবে দেখলে তার রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য অনেকটাই আড়ালে থেকে যায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই সময়ের তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন, উদ্বেগ, প্রতিবাদ এবং নিজের ভূমিকে ভারতের সঙ্গে রাখার আকাঙ্ক্ষা। রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের অন্যতম কার্যকর্তা সন্তু শিকদার বলেন, '১৫ আগস্ট গোটা দেশের স্বাধীনতার দিন। কিন্তু বনগাঁর ইতিহাসে ১৮ আগস্টের গুরুত্ব আলাদা। কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমাদের এই সীমান্তভূমির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনদিন পর বনগাঁ ভারতের অংশ হয়। তাই ১৮ আগস্ট আমাদের কাছে আত্মপরিচয় এবং ভারতের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনের দিন। এই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।' তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু দিল্লি, কলকাতা বা লালকেল্লার ইতিহাস নয়। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের অভিজ্ঞতাও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ জগন্নাথ মণ্ডল বলেন, 'বনগাঁর ১৮ আগস্টকে বুঝতে হলে ১৯৪৭-এর সেই অস্থির সময়টাকে বুঝতে হবে। দেশভাগ মানুষের জীবন, পরিবার, সম্পর্ক এবং ভূগোলকে ছিন্নভিন্ন করেছিল। বনগাঁর মানুষও সেই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন বনগাঁ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন মানুষের মধ্যে যে স্বস্তি ও আবেগ তৈরি হয়েছিল, সেটাই ১৮ আগস্টের মূল তাৎপর্য। এই দিন সারাদেশের কাছে ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।'

তিনি আরও বলেন, 'ইতিহাসকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নয়, সত্যকে জানার জন্য পড়তে হবে। বনগাঁর নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে কেন ১৮ আগস্ট এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এত আবেগের।' হিন্দুত্ববাদী সমাজকর্মী ধনঞ্জয় দেবনাথ বলেন, 'বনগাঁ শুধু একটি সীমান্ত শহর নয়। এটি ভারতমাতার এক ঐতিহাসিক প্রান্তভূমি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এই ভূমি কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তার অবসান হয় ১৮ আগস্ট। তাই এই দিনটি বনগাঁবাসীর কাছে অত্যন্ত আবেগের।' তাঁর কথায়, 'আজকের প্রজন্মকে জানতে হবে--- স্বাধীনতা শুধু একটি সরকারি ছুটির দিন নয়। স্বাধীনতার পিছনে রয়েছে আত্মত্যাগ, উদ্বাস্তু মানুষের কান্না, সীমান্তের মানুষের সংগ্রাম এবং নিজের মাতৃভূমির সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা। ১৮ আগস্ট সেই ইতিহাসকে স্মরণ করার দিন।' ইতিহাস ভুলে গেলে হারিয়ে যাবে বনগাঁর আত্মপরিচয়, আজ ১৮ আগস্ট বনগাঁর বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শ্রদ্ধাঞ্জলি, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণ করা হয়। বনগাঁ মহকুমা আদালতেও এই দিনটি বিশেষ মর্যাদায় পালনের ঐতিহ্য রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো— এই ইতিহাস কি নতুন প্রজন্ম যথেষ্ট জানে? বনগাঁর রাস্তা, বাজার, সীমান্ত, নদী, উদ্বাস্তু কলোনি এবং অসংখ্য পরিবারের স্মৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ১৯৪৭-এর সেই উত্তাল সময়। ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল— এটি সত্য। কিন্তু বনগাঁর মানুষের কাছে ১৮ আগস্টের ইতিহাস সেই জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে স্থানীয় আত্মপরিচয়ের এক বিশেষ অধ্যায়। তাই ১৮ আগস্টকে শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হিসেবে দেখলে চলবে না। এই দিন হওয়া উচিত ইতিহাসচর্চার দিন, দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ করার দিন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে বনগাঁর ঐতিহাসিক সম্পর্ককে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দিন।

১৮ আগস্ট তাই বনগাঁর ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়--- এটি বনগাঁর আত্মপরিচয়ের দিন। যে ভূমি একদিন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ভূমিই আজ ভারতের মানচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই ইতিহাসকে স্মরণ করেই প্রতি বছর ১৮ আগস্ট বনগাঁবাসী উচ্চারণ করে— ভারতমাতা কী জয়।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
খয়রামারি বনগাঁ উঃ ২৪ পরগনা।

কংগ্রেস মুক্ত ভারত করতেই হবে

বন্দে মাতরম্‌কে খণ্ডিত করে কংগ্রেস যে পাপ করেছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রায়শ্চিত্ত করে অখণ্ড বন্দে মাতরম্ গাওয়ার আইন পাশ করেছে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস সেই তোষণনীতির স্বার্থে আবার সেই পাপের পুনরাবৃত্তি করল। স্বাধীনতার দিন কংগ্রেস কার্যালয়ে বন্দে মাতরম্ গাওয়ার সময় সোনিয়া মাইনো পুরো বন্দে মাতরম্ গাইতে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস সভাপতি বলেন যে তারা তাদের পুরনো রীতিতে কর্তিত বন্দে মাতরম্‌ই গাইবে। ভারতবাসীর এটাই সময় যে, কংগ্রেসকে ভারত থেকে মুছে ফেলতে হবে। বন্দে মাতরম্‌কে খণ্ডিত করে কংগ্রেস দেশভাগের পথ প্রশস্ত করেছিল, আবার মুসলমানদের মনে ভারত ভাগের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে— একথা মনে রেখে ভারতকে এখনই কংগ্রেসমুক্ত করতে হবে।

—**সুনীল সরদার,**
ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

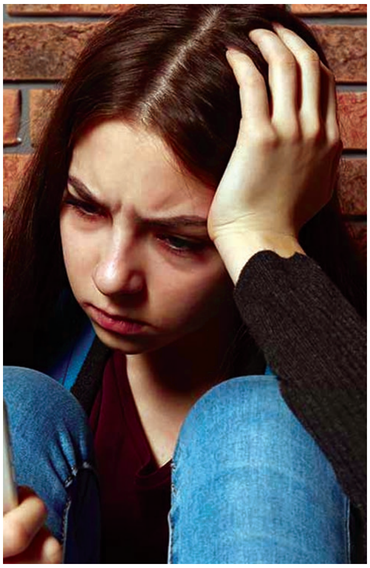

ফিরে আসার পথ হোক আলোকিত

মৌ চৌধুরী

রাজ্যে পালা বদলের পর নারীপাচার রোধ, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের ফিরিয়ে আনা এবং এর ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের গ্রেপ্তারের সাফল্য পেতে শুরু করেছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। গত সপ্তাহে সংসদে দেশে নারীপাচার সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী জেপি নাড্ডা পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন গত এক মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন সময়ে পাচার হয়ে যাওয়া মোট তেত্রিশ জন বিভিন্ন বয়েসী নারীকে ফিরিয়ে এনেছে পুলিশ। এই এক মাসে হারিয়ে যাওয়া মহিলার সংখ্যা ছয়। গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন।

আরও একটি সরকারি পরিসংখ্যান উল্লেখ করতেই হয়, ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নারী পাচারের সংখ্যা ৩৫৭৯ জন। এই বছরেই গুজরাট থেকে ৫৪৮ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ৫২ জন পাচার হয়েছিল। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের এই সংখ্যা ২৬৪৮ জন, ২০২২ সালে ৩০১১ জন। ২০২৩ সাল থেকে এই রাজ্যের নারী পাচারের সঠিক সংখ্যা কোনো দিনও পাওয়া যাবে না। কারণ এই সময়ের পর থেকে রাজ্য সরকার কোনো তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা পুলিশ বা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সেই তথ্যগুলিই কেবল মাত্র নথিবদ্ধ আছে। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনে করেছিলেন রাজ্যকে বদনাম করার জন্য নারী পাচারের বিষয়টি ফুলিয়ে দেখানো হয়।

আগস্ট মাসের শুরুতেই কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ও বর্তমানে মহিলা পাচার রোধের লিগাল সেলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুশীলা জৈন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, নারী বা মূলত নাবালিকা কেন পাচার হয় তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তা নিয়ে উপহারের লোভ-সহ হাজারো কারণ এর পেছনে আছে। দেখা গিয়েছে পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌনকর্মী বা যৌনদাসী ও প্রায় ক্রীতদাসী হয়ে জীবন কাটায়। ফিরে এলেও সমাজ পরিবার এদের সহজে গ্রহণ করতে চায় না।

তাঁর মতে দেশের পূর্ব প্রান্তের রাজ্যগুলো মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর ও ত্রিপুরাতে নারী পাচারের সমস্যা কম। কারণ সেখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আছে। সবথেকে বেশি সমস্যা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলম। কেরলমদের ফাঁদে পড়ে মূলত লাভ জেহাদের কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নানা কারণে পাচার হয়ে যায়। দুই রাজ্যেই নারী পাচার রোধে ও তাদের ফিরিয়ে আনার প্রধান অন্তরায় ছিল প্রশাসন। নারী পাচারের এফআইআর নেওয়া হতো না, স্থানীয় প্রশাসন উদাসীন থাকত। যাদের বাড়ি থেকে মেয়েরা হারিয়ে গিয়েছে খোঁজ নিয়ে সেখানে গেলে শাসক দলের সমর্থকরা বাধা দিত। দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই বাধা প্রদানকারীদের ভেতর অনেকেই পূর্বতন শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে নারী পাচার করত। কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশন এই রাজ্যে পদে পদে বাধা পেয়েছে।

সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের সদ্য অবসর গ্রহণ করা জয়েন্ট ডিরেক্টর শাশ্বতী চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের ভেতর একটা অংশের বিস্তারিত তথ্য পুলিশের কাছে আছে। তাদের ফিরিয়ে এনে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যারা দেশের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় আছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়তো সহজ হবে। কিন্তু পাকিস্তান, আরব বা সিরিয়া-সহ মধ্যপ্রাচ্যে যারা পাচার হয়ে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন। তিনি বলেন, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের কোথায় বিক্রি বা পরিচারিকার নাম করে প্রায় ক্রীতদাসী হিসেবে পাঠানো হবে আগেই ঠিক করা থাকে। কিন্তু গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে কিছুটা সময় লাগে। এর ভেতর যদি পুলিশ জানতে পেরে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে অনেক সময় কার্যকর ফল পাওয়া যেত।

রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে পুলিশকে সব দিক থেকেই সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সুফলও এ রাজ্যের মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। এবারে নিশ্চিত আমাদের ঘরের মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে আর অন্ধকারে যারা হারিয়ে গিয়েছিল তারা আলোর পথ ধরে ফিরে আসবে। □

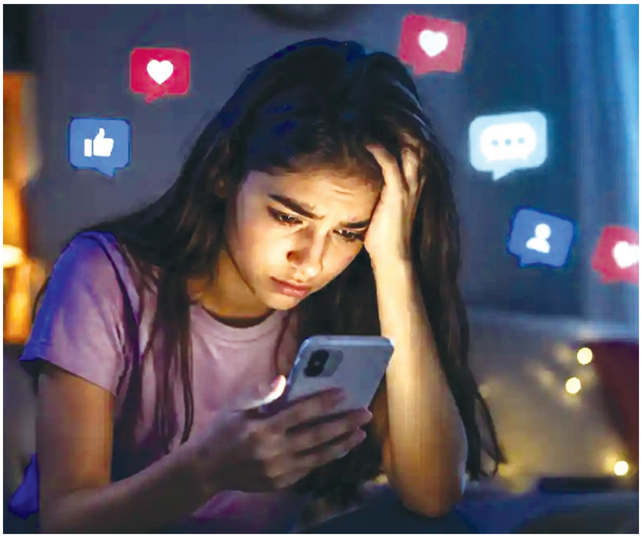

মানসিক উদ্বেগের অন্যতম কারণ সামাজিক মাধ্যম

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এক যুগ আগেও যেখানে মানুষ ফোনে আলাপ, ই-মেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে দূরদূরান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত, আজ সে জায়গা অনেকাংশে দখল করে নিয়েছে সোস্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির অংশ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে ফেসবুক, ট্যুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, লিংকডইন ইত্যাদি। কয়েকবছর আগে থেকেই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতাশার সঙ্গে যুক্ত, বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে। তবে নতুন এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশেষজ্ঞরা যতটা ভাবছেন, তার চেয়েও সমস্যাটি আরও জটিল হতে পারে।

দ্য ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলসেন্ট হেলথ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটিতে যুক্তরাজ্যের ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সি প্রায় ১০ হাজার কিশোর-কিশোরীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। গবেষকরা দেখেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে, তাদের উত্যক্ত করার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এবং তাদের ঘুম ও শারীরিক অনুশীলন হ্রাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা, দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও হতাশা তথা মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

গবেষণাটির সঙ্গে জড়িত ইউসিএল গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথের গবেষক রাসেল ভিনার এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের পরীক্ষালব্ধ ফল দেখায় যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিজে ক্ষতির কারণ নয়, তবে নিয়মিত এগুলো ব্যবহার ঘুম ও ব্যায়ামের মতো মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা কার্যকলাপগুলোতে বাধা সৃষ্টি করে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিজেই মানসিক সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী নাও হতে পারে। বরং এটা কিশোর- কিশোরীদের ঘুমের গুণমান ও ব্যায়ামের অভ্যাস হ্রাস করে দেয় এবং সাইবার উত্যক্তের মুখোমুখি করে। আর এ কারণেই মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সমস্যাগুলো তৈরি হয়।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছিল। কিশোর-কিশোরীরা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ট্যুইটার ও স্ন্যাপচ্যাট-সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের তথ্য জানাত। প্রতিদিন তিনবারের বেশি এগুলো ব্যবহার করলে 'ঘন ঘন ব্যবহার' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গবেষকরা কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সমস্যা এবং তাদের ব্যক্তিগত সুস্থতা, জীবনের তৃপ্তি, সুখ ও উদ্বেগের মতো বিষয়গুলো নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তারা আবিষ্কার করলেন, ঘন ঘন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা কিশোর-কিশোরীরা বৃহত্তর মানবিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিশোরীদের মধ্যে এ প্রভাবগুলো স্পষ্ট ছিল, তারা প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো চেক করে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকট অনেক বেশি।

মেয়েদের এই মনস্তাত্ত্বিক সংকটের ৬০ শতাংশের জন্য খারাপ মানের ঘুম এবং সাইবার উত্তেজনা প্রবাহ। এক্ষেত্রে ব্যায়াম বা শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস কম ভূমিকা পালন করে। তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ঘন ঘন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের প্রভাবগুলো কেবল ১২ শতাংশ হতে পারে। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত। মাত্র কয়েক মাস আগে কানাডায় একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঘন ঘন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বয়ঃসন্ধিকালে হতাশাজনক লক্ষণগুলোর সঙ্গে যুক্ত। এখানেও সেই একই বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, সমস্যাগুলোর সরাসরি সামাজিক মাধ্যমগুলো সৃষ্টি করছে না, বরং এগুলো স্বাস্থ্যকর ঘুম ও ব্যায়ামের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে এ সমস্যাগুলো তৈরি করছে।

গবেষণাটির ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যান ডিএসমেট এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যদি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা ও সাইবার উত্যক্তের মতো ঘটনাগুলো কমিয়ে আনতে পারে, তাহলে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক প্রভাবগুলো আরও সমর্থন করা যেতে পারে।

২০১৭ সালে রয়্যাল সোসাইটি অব পাবলিক হেলথ্ ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সি দেড় হাজার কিশোর-কিশোরীর ওপর একটি সমীক্ষা চালায়। এতে দেখা যায়, স্ন্যাপচ্যাট ও ইনস্টাগ্রাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হীনম্মন্যতা ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জন বলেছে, ইনস্টাগ্রামের কারণে তাদের নিজেদের দেহ নিয়ে মন খারাপ হয়েছে। তরুণ-তরুণীদের অর্ধেকই বলেছে, ফুসফুসের কারণে তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও অশান্তি বেড়ে গেছে।

দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা বলেছে, ফেসবুকের কারণে সাইবার বুলিং বা অনলাইনে অপমান-হয়রানি বা উত্তক্ত করার আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। □

হুতাত্মা চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবারের মতো এবারও গত ১৮ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া অঞ্চলের চকরামপ্রসাদ গ্রামে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে হুতাত্মা বীর চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হয় চকরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা, প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, সহ-প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ সুমন দত্ত, বিভাগ প্রচারক সন্দীপ সামন্ত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন-সহ সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ সরকার এবং তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। অনুষ্ঠানের শুরুতে হুতাত্মা চুড়কা মুর্মুর সমাধিস্থলে আগত স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, অতিথিবর্গ এবং গ্রামবাসী সকলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। কবাডি, তিরন্দাজি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

মালদায় ব্যাসপূজা অনুষ্ঠান

ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল এবং মালদা বিভূতিভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ১৮ আগস্ট অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাসপূজার আয়োজন করা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের পর প্রথা মেনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে জগদ্‌গুরু ব্যাসদেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে শুভারম্ভ হয়। ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের ধ্যেয়মন্ত্র পাঠ করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য তাপসী রানী মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকারিণীর সদস্য ডঃ দেবব্রত মিশ্র, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রবীর কুমার মিত্র এবং ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য রণজিৎ ব্যানার্জী।

প্রেরণামূলক ভাষণে ডঃ মিশ্র শিক্ষার্থীদের জীবনে 'গুরু'র ভূমিকা, মহর্ষি বেদব্যাসের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এবং 'জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০'র কার্যকর বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শ্রীমিত্র বলেন, অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছ থেকে জীবনের মূল্যবোধ বা সংস্কারের যথাযথ শিক্ষা না পাওয়ার ফলে 'জেন-জি' প্রজন্মের মধ্যে অশালীন ভাষা ব্যবহার ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মতো প্রবণতা বাড়ছে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, গুরু-শিষ্য পরম্পরা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে ধারণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীব্যানার্জী তাঁর ভাষণে বিদ্যালয় পরিসরে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে শতাধিক ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তন্ময় দাস ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হাওড়া মহানগরে ‘অধিবক্তা একতা যাত্রা’

ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গত ১৪ আগস্ট হাওড়া জেলা আদালত এবং উলুবেড়িয়া ও আমতা মহকুমা আদালতের অধিবক্তা বন্ধুদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাওড়া মহানগরে অধিবক্তা একতা যাত্রার আয়োজন করা হয়। যাত্রায় ১২০ অধিবক্তা ছাড়াও আইনজীবী পারিবারের বহু সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

এদিন দুপুরে জাতীয় পতাকা হাতে হাওড়া জেলা আদালত প্রদক্ষিণ করে একটি স্থানে সকলেই একত্রিত হন। একতা যাত্রা বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়। যাত্রায় সক্রিয় সহযোগী ছিলেন হাওড়া জেলা আদালতের তিনটি বার অ্যাসোসিয়েশন—দেওয়ানি, ফৌজদারি ও দায়রা আদালতের আইনজীবী বন্ধুরা এবং মাননীয় জেলা জজ মহাশয়। একতা যাত্রার আহ্বায়ক ছিলেন বিশিষ্ট অধিবক্তা সৌমেন সরকার।

‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১৬ আগস্ট সিউড়ী শহরের সুভাষ পল্লীতে ৮৬ বছর বয়স্ক বিশিষ্ট তাঁতশিল্পী ও যাত্রামোদী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ড্রাইভার রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী এবং তাঁর সহধর্মিণী আঙ্গুরবালা দেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ীর সামাজিক সংস্থা ‘শ্রদ্ধা’। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী, ১৯৪৬ সালের হিন্দু রক্ষাকর্তা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রাণবলিদানকারী অংসখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ করে শ্রদ্ধা সংস্থার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন প্রবীণ অনুভবী বৈদ্যনাথ মুখার্জি। গাঙ্গুলী দম্পতির পা ধুয়ে দিয়ে পূজা করেন তাঁদের বৌমা চন্দ্রাণী গাঙ্গুলী এবং কন্যা অর্চনা সেনগুপ্ত। মাল্যভূষিত করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন সহ-সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শিশুমন্দির সমিতির জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দে। আরতি করেন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের অর্ঘ্য হিসেবে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস, অপর্ণা সিংহ ও সুজাতা বিষ্ণু। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন টিনা দাস ও আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাঁদের পুত্র তারকনাথ গাঙ্গুলী, অসীমা মুখ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন মুখ্যোপাধ্যায়। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বালুরঘাট কলেজে 'শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

ব্যক্তিনির্মাণ থেকে রাষ্ট্রনির্মাণ' শীর্ষক আলোচনা সভা

গত ১৯ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট কলেজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতাদর্শ এবং রাষ্ট্র নির্মাণে যুব সমাজের ভূমিকা বিষয়ক 'শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ঃ ব্যক্তিনির্মাণ

থেকে রাষ্ট্রনির্মাণ' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বক্তা হিসেব উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ডঃ ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, কলেজের গ্রন্থাগারিক নিখিল চন্দ্র সরকার এবং অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উচ্চশিক্ষা ও স্কুলশিক্ষা জেলা সভাপতিদ্বয় ডঃ দুলাল বর্মন ও দুর্গেশ দেবনাথ। ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। এরপর কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ ছন্দা চ্যাটার্জি 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র পাঠ করেন কলেজের ছাত্র পরমব্রত সরকার। তারপর সভার বক্তা শ্যামাচরণ রায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একশো বছরের যাত্রা, ব্যক্তি নির্মাণ থেকে রাষ্ট্র নির্মাণ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী-সহ কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কলকাতায় বিশ্ব আয়ুর্বেদ পরিষদের 'চরক জয়ন্তী' উদ্‌যাপন

গত ১৭ আগস্ট কলকাতার 'ব্যাস' (VYAS) ইনস্টিটিউটে বিশ্ব আয়ুর্বেদ পরিষদের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী আর্যেশানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়, 'ব্যাস'-এর নির্দেশক ডঃ অভিজিৎ ঘোষ, হিন্দি স্বস্তিকা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে এবং নাগার্জুন আয়ুর্বেদের ডাঃ রাজেশ ডি চেরান। ডাঃ চেরান কেরালা শৈলীর পঞ্চকর্ম চিকিৎসা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে তিনজন চিকিৎসক ডাঃ অর্কপ্রভ জামনা, ডাঃ সমরজিৎ ঘটক ও ডাঃ বিলাস সরকারকে 'আচার্য চরক সম্মান-২০২৬' প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। আনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল আয়ুর্বেদ

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংস্কৃত অন্ত্যাক্ষরীর আয়োজন। বিশ্ব আয়ুর্বেদ পরিষদের সভাপতি ডাঃ অর্ণব রায় এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শৈলেন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ ও ধ্যান বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

ভারতীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্যের আলোকে যোগ ও ধ্যানের তাৎপর্য এবং বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিদিবসীয় জাতীয় কর্মশালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে এবং RUSA 2.0-র সহযোগিতায় গত ১২ থেকে ১৪ আগস্ট এই কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হল, OAT এবং অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল হলে।

১২ তারিখে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিভাগীয় ছাত্রীদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভারম্ভ হয়। উদ্বোধনী সত্রে স্বাগত ভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা তথা বিভাগীয় প্রধান ডঃ শিউলি বসু। উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর তথা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অমিতাভ দত্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যজিৎ লায়েক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক তথা রেজিস্ট্রার ডঃ লোকনাথ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক ডঃ দেবদাস মণ্ডলের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্ব সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিনে যোগাভ্যাসের বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্য, সংস্কৃতভাষা ও

স্বাধীনতা দিবসে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবলে।

যোগচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আকাদেমি অফ রিসার্চ ফর কালটিভেশন অব ইন্ডিয়ান সায়েন্সেস-এর গবেষণা আধিকারিক ডঃ শোভনলাল মিশ্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার মণ্ডল এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা কাকলি ঘোষ। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা সর্বাণী গাঙ্গুলী।

কর্মশালার শেষ দিনে যোগাভ্যাসের পাশাপাশি শিক্ষা ও ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তা হিসেবে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক মুক্তিপদ সিনহা। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা দেবার্চনা সরকার। এর পর হয় গবেষণাপত্র উপস্থাপনা পর্ব। এই পর্বের সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সর্বাণী গাঙ্গুলী। তিনদিনের কর্মশালা সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তা হিসেবে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ তপতী মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ বিকাশ সরদার। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সপ্তম বার্ষিকী অধিবেশন

গত ২৩,২৫ ও ২৬ জুলাই ত্রিদিবসীয় সাহিত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সপ্তম বার্ষিকী অধিবেশন। ২৩ জুলাই সিউড়ী জেলখানার সামনে ফুটপাতে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ২৫ জুলাই সিউড়ী লিজ ক্লাব শতবার্ষিকী সভাকক্ষে প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ষষ্ঠ স্মারক বক্তৃতা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে আয়োজিত হয় 'বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-তারাশঙ্কর ঃ সাম্প্রতিক জাতীয়তার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাবনা এবং সংহতি চেতনা' শীর্ষক জাতীয় আলোচনা চক্র। সমগ্র অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমল পাল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধায়, দুমকা (SKMU) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সন্তোষ কুমার শীল এবং হেতমপুর

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক তপন গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি নরনারায়ণ ভট্টাচার্য। এদিন মোট ১৪ জন গবেষক তাঁদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে এদিন সিউড়ী সরোজিনীদেবী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২৬ জুলাই 'আমার জন্মভূমি আমার দেশ' শীর্ষক একটি রাজ্যস্তরীয় কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১০০ জন কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা-সহ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, এবারের এই ত্রিদিবসীয় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান বীরভূমের ইতিহাসে এক ভিন্ন কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যার শিরোনাম হতে পারে ' রাষ্ট্রবাদী লেখকের প্রতি প্রশাসনের এক বিস্ময়কর শিষ্টাচারের দিন।' উল্লেখ্য, তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে ২০২৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সিউড়ী জেলা সংশোধনাগারে তারাশঙ্করের একটি আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালে সিউড়ী জেলখানায় রাজবন্দি থাকাকালীন তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের এক নতুন রূপান্তর ঘটেছিল। কারাগারেই তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পাষাণপুরী' যা আজও সিউড়ী সংশোধনাগারের একমাত্র ঐতিহাসিক দলিল।

এবারের জন্মজয়ন্তীতে সেই আবক্ষমূর্তির পাদপীঠে মাল্যদানের উদ্দেশে সংস্থার পক্ষ থেকে দু'মাস ধরে বীরভূম জেলাশাসক এবং জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নির্দেশমতো বারাবার চিঠি দেওয়া সত্তেও, ২৩ জুলাইয়ের ঠিক আগের দিন রাতে ৯ দফা বিধিনিষেধ জারি করে মাত্র পাঁচজনকে মূর্তিতে মাল্যদানের অনুমতি দেওয়া হয়, যেখানে ২০-২৫ সাহিত্যপ্রেমী মানুষের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, যেখানে প্রতিদিন বন্দিদের দেখতে শত শত মানুষের অবাধ প্রবেশ ঘটে এবং প্রতি বছর সংশোধনাগারের ভেতরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়, সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক ভূমিপুত্র তারাশঙ্করের মূর্তিতে মালা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের এই প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ও স্মরণে রাখার মতো বিষয়। অহেতুক প্রতিবন্ধকতার প্রতিবাদে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ-সহ সিউড়ীর অন্যান্য সারস্বত-সংস্থাগুলি সংশোধনাগারের সামনের ফুটপাতে তারাশঙ্কর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে রাজ্য কারাবিভাগের আইজি লক্ষ্মীনারায়ণ মীনার সঙ্গে ফোনে কথা বললে তিনি তিনি বলেন, 'তারাশঙ্করের জন্ম কি জেলখানায় হয়েছিল নাকি যে জেলখানায় তাঁর জন্মদিন পালন করতে হবে!' উপস্থিত সকলেই এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

এনএমও-র উদ্যোগে NEET - UG নথি যাচাই সহায়তা কেন্দ্র

ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও), পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে গত গত ১৪, ১৬ ও ১৮ আগস্ট ৮টি প্রধান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে NEET - UG নথি যাচাই সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। কলেজগুলি হলো--- বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মেদিনীপুর গভর্নমেন্ট কলেজ ও হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, IPGMER & SSKM হাসপাতাল এবং বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল ক্যালেজ ও হাসপাতাল।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদ্য NEET - UG 2026-এর মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের নথি যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। ভর্তি ও নথি যাচাইকরণের প্রক্রিয়া অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে জটিল ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে এনএমও-র কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষ উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বিঘ্নে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। এই সহায়তা কেন্দ্র সদ্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করতে চলা পড়ুয়াদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি তাদের শিক্ষাগত, পেশাগত ও কর্মজীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। এই কর্মসূচিতে ২১০ জন এনএমও-র কার্যকর্তা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনদিনে তাঁরা ৩৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সহায়তা প্রদান করেন। তাছাড়া ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়।

এই ধরনের সেবামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে এনএমও পশ্চিমবঙ্গে আগামী প্রজন্মের চিকিৎসকদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ, পেশাগত দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সমাজসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসক সমাজের পাশে থাকার অঙ্গীকার অব্যাহত রাখবে।

বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সঙ্ঘ এবং অখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনের যৌথ উদ্যোগে রাজ্য ন্যাশনাল আয়ুষ মিশনে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রয়াসে একটি বিশেষ প্রতিনিধি দলের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মিশনের অধীনস্থ চিকিৎসকদের নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংবলিত বিষয়াবলী নিয়ে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে এক ত্রিদিবসীয় সুদূরপ্রসারী ও গঠনমূলক পর্যালোচনা পর্ব সম্পন্ন হয়। প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় আয়ুষ সচিব রাজেশ কোটেজা, ভারত সরকারের আয়ুর্বেদ বিষয়ক উপদেষ্টা কৌস্তভ উপাধ্যায় এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠকে মিলিত হন।

রাজ্য যুব কেন্দ্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিষয়ক সভা

গত ২৬ জুলাই মধ্য কলকাতা-স্থিত রাজ্য যুব কেন্দ্রে নেতাজী অনুরাগী বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'আজাদ হিন্দ পিপল্স্ মিশন' সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত কিছু বিতর্কিত রাজনৈতিক বক্তব্যের আবহে 'নেতাজীর অপমান রাষ্ট্রের অসম্মান'-শীর্ষক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সম্প্রতি কয়েকজন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয়ে অকারণে কিছু মন্তব্য করেন, যার কোনোরকম ঐতিহাসিক সারবত্তা নেই। তাদের সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন ও নেতাজী অনুরাগীদের মধ্যে। এরই প্রেক্ষাপটে গত ২৬ জুলাই উপরোক্ত প্রতিবাদ সভায় রাজ্য যুব কেন্দ্রে অনেকগুলি সংগঠন যোগদান করে। 'INA-anthem'-এর মাধ্যমে এদিন সভার সূচনা হয়। 'আজাদ হিন্দ পিপল্স্ মিশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন বক্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই ধরনের অসম্মানজনক উক্তি অবিলম্বে প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে মুখর হন। উল্লেখ্য, দেশপ্রেমিকোত্তম নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বামপন্থীরা দীর্ঘকাল ধরে কুরুচিকর আক্রমণ ও অসম্মান করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তথাকথিত রাজনৈতিক সংঘাতের তত্ত্বও তাদেরই সৃষ্টি। সম্প্রতি তাদের অপপ্রচারের ফাঁদে পা দিয়েছেন কয়েকজন রাজনীতিক। এর প্রতিবাদে আগামীদিনে পথে নেমে জন-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন আজাদ হিন্দ পিপল্স্ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ তেওয়ারী এবং সভায় সমবেত সকলেই তা সমর্থন জানান।

নেতাজী গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী— পাঠ্যপুস্তকে সঠিকভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন ও তাঁর সংগ্রামকে তুলে ধরার পাশাপাশি নেতাজী সংক্রান্ত ১০ দফা দাবি উপস্থাপন করেন এবং আগামীদিনে এই দাবিপত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে বলে তিনি জানান। 'নেতাজী অ্যাকাডেমি'র পক্ষ থেকে ডঃ পরিমল কান্তি মণ্ডল, 'নেতাজী চেতনা মঞ্চ'-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ম গুহ, 'নেতাজী ব্রিগেড এক সংগ্রাম'-এর পক্ষ থেকে ডঃ ইন্দ্রনীল ঠাকুর, 'সন্তান দল'-এর পক্ষ থেকে মনীষা দাস, 'স্বামীজী-নেতাজী ইনস্টিটিউট'-এর পক্ষ থেকে চন্দ্রদীপ দে, 'নেতাজী ফ্রন্ট'-এর পক্ষ থেকে ডঃ দ্বীপায়ন পাল, 'রাণাঘাট হেল্পিং হ্যান্ড'-এর প্রতীক পাল, অনর্ঘ্য সরকার, শ্রাবন্তী মণ্ডল-সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, আগামীদিনে বিভিন্ন জেলায় নেতাজী অনুরাগীরা এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে এদিনের সভার পরিসমাপ্তি হয়।

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে প্রকাশিত হলো ‘হিরোজ অব এশিয়া—ভলিউম’

নোভার্সিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কলকাতার বৌবাজারের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিশেন হলে গত ২০ আগস্ট অখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে প্রকাশিত হলো ‘হিরোজ অব এশিয়া—ভলিউম’। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বিমল শঙ্কর নন্দ, সায়ন্তন বসু, ডঃ জিষ্ণু বসু, মানিক দোলুই, নীতীশ বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ থেকে অ্যাডভোকেট, লেখক তথা কান্ত্রি কনভেনর, HRCBM বাংলাদেশ চ্যাপ্টার লাকি বাছার-সহ ভারত ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট অতিথি, গবেষক, সহযোগী লেখক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য গণ্যমান্য বক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল এবং ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁরা বই প্রকাশনার সাফল্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে ফাউনেজডেশনের উদ্যোগের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন। নোভার্সিটি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শুভ্র চক্রবর্তী উপদেষ্টা শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক শ্রীমতী মঞ্জু মুখোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস নন্দী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নোভার্সিটি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শুভ্র চক্রবর্তীর ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো, অখ্যাত ও স্বল্পপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও অবদান নিয়ে গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং তাঁদের অনুপ্রেরণামূলক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই খণ্ডে চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়, বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস, লেফটেন্যান্ট সুনীল কুমার ব্যানার্জি, ক্রান্তিবীর হৃদয়রঞ্জন চক্রবর্তী, সর্দার বলবন্ত সিংহ পরদেশী, কেদারেশ্বর চৌধুরী, বালিচরণ দাস, খড়্গবল্লভ দাস, পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়, রফিজুদ্দিন আহমেদ, পুরেন্দ্র নারায়ণ নাথ-সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীর জীবন ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে। ‘হিরোজ অব এশিয়া’র মাধ্যমে নোভার্সিটি ফাউন্ডেশন সেই সমস্ত বীরের ইতিহাস সামনে আনার চেষ্টা করছে, যাঁদের অবদান আজও পারিবারিক স্মৃতি, আঞ্চলিক ইতিহাস এবং ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা ঐতিহাসিক নথির মধ্যে সীমাবদ্ধ। একসিঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, আত্মত্যাগ, সততা ও দেশপ্রেমের আদর্শে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

5 BHK GRAND RESIDENCES

ECAUSE TRUE LUXURY MAKES ROOM FOR FAMILY

NOW MORE

4.46 CR* ONWARDS I FORESHORE ROAD

RERA.WB.GOV.IN | WBRERA/P/HOW/2025/003467 | ICICI Bank

98830 55000

PRIMARC AADVIKA

হারানো পত্রিকা— নয়

উপাসনায় মুগ্ধ ছিল বঙ্গ

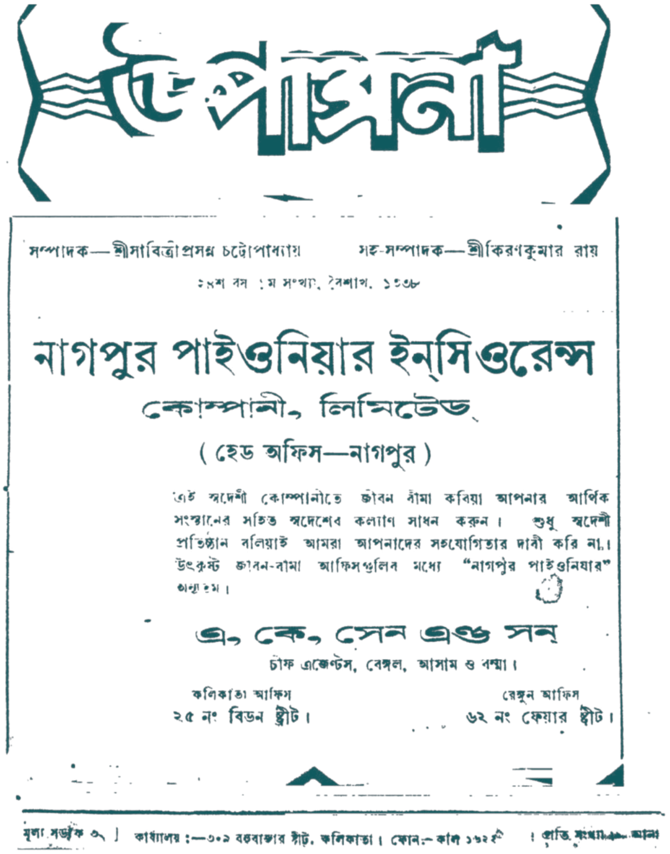
উপাসনা

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৮

নাগপুর পাইওনিয়ার ইন্‌সিওরেন্স

কোম্পানী, লিমিটেড

(হেড অফিস—নাগপুর)

এই স্বদেশী কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়া আপনার আর্থিক সংস্থানের সহিত স্বদেশের কল্যাণ সাধন করুন। শুধু স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বলিয়াই আমরা আপনাদের সহযোগিতার দাবী করি না। উৎকৃষ্ট জীবন-বীমা আফিসগুলির মধ্যে "নাগপুর পাইওনিয়ার" অন্যতম।

এ, কে, সেন এণ্ড সন্

চীফ এজেন্টস, বেঙ্গল, আসাম ও বর্ম্মা।

কলিকাতা আফিস
২৫ নং বিডন ষ্ট্রীট।

রেঙ্গুন আফিস
৬২ নং ফেয়ার ষ্ট্রীট।

মূল্য সডাক ৩৲। কার্য্যালয় :—৩০৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কাল ১৬২৫। প্রতি সংখ্যা [illegible] আনা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

একটি নাম কেবল একটি নাম নয়। এটি একটি পরিচায়ক। নির্দেশক। তবে কোনো কোনো নাম অনেক বেশি বার্তাবহ। তার ব্যঞ্জনা অনেক বেশি তাৎপর্যময়। সাদা চোখে যা দেখা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি ঘটনা, অনেক বেশি তথ্য থাকে সেই নামের আড়ালে। 'উপাসনা' এমনই একটি নাম।

'উপাসনা' বিশ শতকের একটি মাসিক পত্রিকা। বিশ শতকেরই পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে তো রয়েছে এমন কত না পত্রিকা। কিন্তু মাসিক 'উপাসনা'-র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এমন বেশ কিছু তথ্য, যার কারণে অখণ্ড পত্রিকার ভিড়ে মাসিক 'উপাসনা' আজও চিহ্নিত হয়ে আছে অনন্য হিসেবে।

কিছুটা আকস্মিক আবার কিছুটা অনিবার্য কারণেই আবির্ভাব ঘটে মাসিক 'উপাসনা'-র। একজন মানুষের জীবন থেকে দারিদ্র্যনামক অমাবস্যার অন্ধকার দূর করার জন্যই প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। আর সেই কাজটি করেন বঙ্গের ইতিহাসে দানবীর নামে খ্যাত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। একজন মানুষ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা এবং ওই জাতীয় দাতব্য

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কাজে যে অমন ভাবে দান করতে পারেন তা ছিল গান্ধীজীরও কল্পনার অতীত। সবিস্ময়ে তিনি বলেন, দাতা হিসেবে ভারতের পার্শি সম্প্রদায় সবচেয়ে এগিয়ে এটাই তাঁর ধারণা। কিন্তু এককভাবে মণীন্দ্রচন্দ্রের মতো দান তাঁরাও করতে পারেননি।

দান করার ব্যাপারে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন সতত উদার হস্ত। এ ব্যাপারে তেমন বাছবিচার ছিল না তাঁর। তবে নিজের জেলা মুর্শিদাবাদের কৃতী মানুষের সম্পর্কে তাঁর ছিল বিশেষ দুর্বলতা। সেই দুর্বলতার কারণেই তাঁরই জেলার কৃতী সন্তান, সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কলকাতায় আইন ব্যবসায় তেমন পসার জমাতে না পারার কারণে বিশেষ আর্থিক অনটনে রয়েছেন শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর সমস্ত ধারদেনা শোধ করে, তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন বহরমপুরে। নিজেই নিলেন তাঁর সব কিছুর ভার। আর তার জন্য নিলেন দ্বিমুখী কার্যক্রম।

প্রথমত তিনি চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের জন্য আজীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট করলেন। মহারাজ ছিলেন চন্দ্রশেখরের সাহিত্যের অনুরাগী। সাহিত্যপত্র সম্পাদনার তাঁর যে দক্ষতা রয়েছে সেকথাও জানতেন তিনি। তাই তাঁর সংসার প্রতিপালনের জন্য বের করলেন

একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা— 'উপাসনা'। আর সেই পত্রিকার সম্পাদক পদে নিয়োগ করলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে।

এর আগে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে চন্দ্রশেখর বহরমপুর থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশ করেন 'মাসিক সমালোচক' নামে একটি পত্রিকা। সে পত্রিকা সম্পর্কে 'ভারতী'-র (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬) সপ্রশংস মন্তব্য, 'এই মাসিক পত্রখানি আমরা অতিশয় প্রীতির সহিত পাঠ করিলাম। উত্তরে 'সখীর প্রতি' বলিয়া কবিতাটি যেমন সুন্দর হইয়াছে, 'বাঙ্গলার বর্তমান অবস্থা' বিষয়ক প্রবন্ধটিও তেমনি সৎ-চিন্তামূলক হইয়াছে— অন্যান্য গ্রন্থগুলিও মন্দ হয় নাই।'

'মাসিক সমালোচক' দীর্ঘজীবী ছিল না। কিন্তু ওই অল্প সময়েই পত্রিকাটি কেবল বহরমপুর নয়, তার বাইরেও পাঠক মহলে এক ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও ছিলেন সে সময় ওই কাগজের একজন গুণগ্রাহী। সম্পাদনা কাজে চন্দ্রশেখরের ওই দক্ষতার কথা মাথায় রেখেই মণীন্দ্র নন্দী 'উপাসনা' পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সম্পাদক করেন চন্দ্রশেখরকেই। পত্রিকাটি পরিচালনার জন্যই তিনি সম্ভবত উপাসনা সমিতি গঠন করেন। সমিতির মুকুন্দলাল বসু ছিলেন ওই সমিতির পক্ষে 'উপাসনা' পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক।

'উপাসনা' পত্রিকা সম্পর্কে কিছু বলার আগে ওই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২ খ্রিঃ) সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। বঙ্কিমযুগের সন্দর্ভকার চন্দ্রশেখর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন,— 'চন্দ্রশেখরের লেখায় কলম ডালিবার যো নাই'।

চন্দ্রশেখরের গ্রন্থ সংখ্যা সে অর্থে খুব বেশি নয়, কিন্তু অল্প লিখলেও তিনি ছিলেন বঙ্কিম-যুগের অন্যতম সার্থক রচনাকার। তাই তাঁর মৃত্যুর পর বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক লেখেন,— ''চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কেমন পুরুষ ছিলেন, তাহা আধুনিক যুবজন জানে না— বুঝি বা তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টাও করে না। চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন ঋষি বা স্রষ্টা প্রবর্তক ছিলেন। গদ্যে পদ্যের ভাব ও রসোল্লাস, মাধুরী ও বচনচাতুরী তিনিই প্রথমে আমদানী করেন। তাঁহার 'উদভ্রান্ত প্রেম' গদ্যে একখানি মহাকাব্য,— অপূর্ব, অতুল্য এবং অদ্বিতীয়।'' (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য, কার্তিক, ১৩২৯)।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রকাশ মাত্রই পাঠকদের মন জয় করে। সমালোচকরাও হন উচ্ছ্বসিত। তাঁদের অনেকেরই অভিমত, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর পর আর কিছু না লিখলেও চন্দ্রশেখর প্রকৃত অর্থেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়েই থাকতেন। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'সারস্বত কুঞ্জ' (১৮৮৬)-ও মুগ্ধ করে সকলকে। এছাড়া চন্দ্রশেখরের লেখা অন্যান্য বইগুলি সে সময় ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বঙ্কিমযুগের এহেন জনপ্রিয় সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'উপাসনা'-র আবির্ভাব ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে। তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ১৩১৮ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ পত্রিকাটির প্রথম আট বছরের পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এই সাহিত্য পত্রিকাটির সম্পাদক। বিষয় বৈচিত্র্যে 'উপাসনা' আবির্ভাব লগ্ন থেকেই পাঠক মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়। পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট বেশি।

'উপাসনা'-র জীবনকাল ১৩১১ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৩৯-র পৌষ মাস,— কম-বেশি আঠাশ বছর। মাঝে নানা কারণে ১৩৩১-এর অগ্রহায়ণ থেকে বছর চার বন্ধ ছিল পত্রিকার প্রকাশনা। বাংলা সাময়িক পত্রের গড় আয়ুর তুলনায়— অবশ্যই 'উপাসনা' দীর্ঘজীবী। পাঠকদের সমর্থন ছাড়া এতদিন একটি পত্রিকা চালানো যে প্রায় অসম্ভব, একথা মানতেই হবে।

'উপাসনা'-র জীবনকালকে ভাগ করা যায় মোটামুটি চারটি পর্বে। এই চার পর্বে সম্পাদক ছিলেন চারজন। তাঁদের সম্পাদনানীতি, আদর্শ ও বিচারবোধের প্রতিফলন ঘটেছে এই চারটি পর্বে। আর ওই চার পর্বের সব বৈশিষ্ট্য মিলিয়েই 'উপাসনা' বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার করে আছে।

পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৩১৯ সালে ইস্তফা দিলে সম্পাদক হন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক, সেকালের খ্যাতিমান সাহিত্যিক, 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯১৫ খ্রিঃ)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্নেহধন্য যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে পত্রিকাটির চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তনের প্রলেপ পড়ে। পত্রিকার পূর্বতন লেখকদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত নতুন কিছু লেখকের রচনাও পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সেইসঙ্গে পত্রিকার পাঠক সংখ্যাও হয় কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী।

'উপাসনা' পত্রিকার কার্যালয় প্রথম থেকে বহরমপুরেই ছিল। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ১৩২৩ সালে পত্রিকার হাল ধরেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সাহিত্যমনস্ক অর্থনীতি ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৮ খ্রিঃ)। ওই সময় পত্রিকার কার্যালয় বহরমপুর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৩২৮ সালে তাঁকে সাহায্য করার জন্য সহ-সম্পাদক পদে নিয়োগ করা হয় কবি-সাহিত্যিক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৯৮-১৯৬৫ খ্রিঃ)। ১৩৩৫ সালে সাবিত্রীপ্রসন্নই পত্রিকার শেষ সম্পাদক।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকেই 'উপাসনা'-র চিন্তাধারায় আসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক কথাকাররাও যুক্ত হতে থাকেন পত্রিকার সঙ্গে। সাবিত্রীপ্রসন্ন সম্পাদক হওয়ার পর পত্রিকার লেখক তালিকায় প্রতিষ্ঠিত ওইসব সাহিত্যিকদের পাল্লাই ভারি হয়। 'উপাসনা'-রও ক্রমে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পত্রিকা থেকে প্রায় পুরোপুরি গল্প-উপন্যাসভিত্তিক সাহিত্য পত্রিকার উত্তরণ ঘটে।

'উপাসনা'-র প্রথম সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসেবে ছিলেন বঙ্কিম-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নীতির অনুসারী। তাঁরই আদর্শে 'উপাসনা' সম্পাদনা করতেন তিনি। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ছিলেন কিছুটা সনাতনী ধারার মানুষ। ভারতের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করার জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি থাকতেন সচেষ্ট। সে কারণে গল্প উপন্যাসের চেয়েও পত্রিকার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে থাকত ভারত সংস্কৃতি-সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ। এক্ষেত্রে পত্রিকার যথেষ্ট প্রাধান্য পেতেন দেশের বিদগ্ধ সংস্কৃতসেবী পণ্ডিত মহল। মননশীল ওইসব প্রবন্ধের ভারে সে সময়ের 'উপাসনা' ছিল যথেষ্ট গুরুগম্ভীর। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের চেয়েও অপেক্ষাকৃত নবীনদের প্রতি ছিল তাঁর টান। তবে তাঁদের নিয়ে পত্রিকার নিজস্ব এক লেখকমণ্ডলী গড়ার দিকে তাঁর নজর ছিল না। বরং নতুন কারো ভালো লেখা পেলেই তিনি তা করতেন পত্রস্থ।

প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক লেখার ভিড়ের মধ্যেও থাকত এক আধটা গল্প-কাহিনি। তবে ধারাবাহিক উপন্যাস জাতীয় কোনো রচনা থাকত না পত্রিকায়। সনাতনী চিন্তাধারার মানুষ হলেও চন্দ্রশেখর কিন্তু বিজ্ঞান বা আধুনিক বিষয়কে একেবারেই উপেক্ষা করেননি। তাই সেই সময়ের 'উপাসনা'-য় জলদানন্দ রায়ের মতো বিজ্ঞানমনস্কদের রচনাও প্রকাশিত হতো। রজনীকান্ত সেন, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মতো কবিদের কবিতা ছিল পত্রিকার সম্পদ।

একইভাবে স্বামী অখণ্ডানন্দের ভ্রমণ কাহিনি, কালীবর বেদান্তবাগীশের বৈদান্তিক প্রবন্ধ বা যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা বিষয়ের রচনা পাঠকদের জানার খিদে মেটানোর পক্ষে ছিল যথেষ্ট উপাদেয়। সব মিলিয়ে সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় শুরুর ওই আটটি বছর যেভাবে 'উপাসনা' সম্পাদনা করেন তাতে অল্পদিনের মধ্যে পত্রিকাটির বনিয়াদ হয় যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পরবর্তী কুড়ি বছরে পত্রিকাটির চরিত্র বদল হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু শুরুর ওই শক্ত ভিত্তিভূমি, বিশেষ লেখকমণ্ডলী ও পাঠকসমাজ 'উপাসনা'-কে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে এক স্বর্ণ সিংহাসনে।

'উপাসনা'-র প্রকাশনার পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত প্রচারে আসতে চাননি। তাই প্রথম দিকে তাঁর নাম সম্ভবত অযুক্ত থেকে গেছে। তবে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা'-র পরের দিকে তাঁর নাম প্রকাশিত হতো পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। একবারে শেষের দিকে 'উপাসনা'-য় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর নামের উল্লেখ দেখা যায়।

প্রথম দিকে 'উপাসনা'-র কার্যালয়ই কেবল বহরমপুরে ছিল না ছাপাও হতো 'কাশিমবাজার সত্যরত্ন যন্ত্রে'। পরে অবশ্য কলকাতাই ছিল এই পত্রিকার ঠিকানা। পত্রিকার মাসিক মূল্য ছিল পাঁচ আনা এবং বার্ষিক তিন টাকা। পরে মাসিকের মূল্য কমিয়ে চার আনা করা হয়।

'উপাসনা'-র প্রথম পর্বে প্রতি সংখ্যার শিরোনামের নীচে ছাপা হতো, 'বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দু সভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিয়ে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দু সমাজ তোমার জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমাদের কৈশোরের মধুবন, তোমার সম্পদের দ্বারকা, তোমার ধর্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ শয়নের সাগর- সৈকত।'

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হওয়ার পর 'উপাসনা'-র প্রতি সংখ্যায় শিরোনামের নীচের গদ্যাংশের বদলে ছাপা হতো তিন চরণের এক কবিতা—

'সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে কে করে তটিনী পারাপার,

অকূল হতে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধানো পারাবার,

লক্ষ যুগ পশরা লয়ে শিরে বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।'

'উপাসনা'-র বিভিন্ন পর্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং সম্পাদক বদলের ফলে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিতেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেছে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হওয়ার পর 'উপাসনা'য় সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র নিয়েও নানা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে ভারতবর্ষে পল্লিসমাজের উন্নতি না হলে যে দেশের উন্নয়ন হবে না একথাও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়। বলা হয়,— 'আমাদের সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুলভাবে বিস্তৃত হইয়া, আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে-গ্রামে, মহকুমায়-মহাকুমায়, জেলায়-জেলায় একনিষ্ঠ কল্যাণকর্মী পল্লিসেবকের প্রয়োজন। পল্লিসেবকের ভাবুকতা, উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে।' তবে এই কাজে যে দেশের ধনী ও জমিদারদেরও যুক্ত হবার প্রয়োজন আছে সেকথা জোর গলাতেই সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঘোষণা করা হয়।

'উপাসনা'-য় বিভিন্ন মত ও পথের যেসব মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার থেকে সমকালের বৌদ্ধিক আন্দোলনের রূপটিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

'উপাসনা'-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য-এর বিভিন্ন বিভাগ 'ভাববার কথা', 'পঞ্চামৃত', 'পল্লীবার্তা', 'বিশ্ববাণী', 'আলোবনী', 'মাসিক কাব্য সমালোচনা' প্রভৃতি বিভাগীয় শিরোনামগুলি অবশ্যই বিষয় বৈচিত্র্যেরই ইঙ্গিত দেয়। তবে সবগুলিই নিয়মিত ছিল না। দেশবিদেশ, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, পল্লিজীবন ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে এই বিভাগগুলি পরিচালিত হতো।

'উপনাসনা'য় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কাজী নজরুল, মোহিতলাল মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কবি, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিনয় কুমার সরকার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিমানবিহারী মজুমদার, পরিমল গোস্বামী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্টজনরা ছিল এই পত্রিকার লেখক।

সব মিলিয়ে স্বাধীনতা-পূর্ব বিশ শতকের বিখ্যাত পত্রপত্রিকার আকাশে 'উপাসনা' ছিল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। □

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশ্বদূত
পরমহংস যোগানন্দের ঐতিহাসিক প্রভাব

সুব্রত বাঁশ

একবিংশ শতকের শুরুতে যখন বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছিল, তখন এক ভারতীয় সাধক নিরবে রচনা করছিলেন এক ভিন্ন বিপ্লবের ইতিহাস—আধ্যাত্মিক বিপ্লবের। তিনি হলেন পরমহংস যোগানন্দ (১৮৯৩-১৯৫২), যিনি পশ্চিমি বিশ্বে ভারতীয় যোগ, ধ্যান ও আত্মোন্নয়নের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। ১৯২০ সালে আমেরিকার বোস্টনে অনুষ্ঠিত International Congress of Religious Liberals-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে পরমহংস যোগানন্দ প্রথমবার বিদেশভ্রমণে যান। এই যাত্রা ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা বিন্দু। একই বছরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Self-Realization Fellowship (SRF)—একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন, যার উদ্দেশ্য ছিল যোগ, ধ্যান ও আত্ম-উপলব্ধির শিক্ষাকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। যোগানন্দের মতে, 'মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন, যা ধ্যান ও ক্রিয়া যোগের মাধ্যমে সম্ভব।' এই বার্তা শুধু ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত পশ্চিমি সমাজে।

১৯২৫ সালে তিনি লস অ্যাঞ্জেলসে এসআরএফ-এর আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর স্থাপন করেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দর্শনের বিস্তার ঘটান। তিনি হাজার হাজার মার্কিন শিক্ষার্থীকে 'ক্রিয়া যোগ' চর্চার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির পথ দেখান। সেই সময়ের সংবাদপত্রে তাঁকে 'The first yoga master of India to make America his permanent home' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীতে দেখা যায়—হিন্দু দর্শনের সারাংশ, খ্রিস্টীয় আদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির এক সম্মিলিত প্রবাহ। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক সেতুবন্ধনের প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা নিঃসন্দেহে তাঁর আত্মজীবনী Autobiography of a Yogi। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত এই বইটি আজও বিশ্বজুড়ে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকারীদের অন্যতম অনুপ্রেরণা। গ্রন্থটি ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে বেস্টসেলার তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে।

বিশেষত উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাপ্‌ল কর্পোরেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস এই বইটিকে তাঁর জীবনের অন্যতম দিকনির্দেশক বলে মনে করতেন। এমনকী তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত প্রতিটি অতিথিকে এই বইটি উপহার দেওয়া হয়েছিল। যোগানন্দ বিশ্বাস করতেন, সকল ধর্মই এক বৃহৎ সত্যের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি রচনা করেন The Second Coming of Christ, যেখানে তিনি যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেন যোগের আলোকে। এতে তিনি প্রমাণ করেন, খ্রিস্ট ও হিন্দু দর্শনের মধ্যে মৌলিক সংযোগ বিদ্যমান। এই ব্যাখ্যা ধর্মীয় সহনশীলতা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। পশ্চিমি বিশ্বে এক সময় যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে পরমহংস যোগানন্দ বলেন, 'আমরা বিশ্বজয় করতে চাই না অস্ত্র দিয়ে, চাই না অর্থ দিয়ে; আমরা বিশ্বজয় করতে চাই ঈশ্বরের প্রেম ও আত্মজ্ঞানের আলো দিয়ে।' ১৯৫২ সালে তাঁর শরীর প্রস্থানের পরেও এসআরএফ ও ভারতের Yogoda Satsanga Society (YSS) যোগানন্দের শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত রয়েছে। এসআরএফ-এর সদর দপ্তর এখনও লস অ্যাঞ্জেলসেই অবস্থিত এবং বিশ্বের প্রায় ৬০টিরও বেশি দেশে তাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র রয়েছে। যোগানন্দের 'How to Live' সিরিজের সাতটি গ্রন্থ আজও মানুষকে ব্যক্তিগত সমস্যা, দুশ্চিন্তা, একাকিত্ব এবং জীবনের লক্ষ্যহীনতা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

বর্তমানেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যোগানন্দের দর্শন পড়ানো হয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগের পাঠ্যক্রমে। তাঁর শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু পশ্চিমি যুবক ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ভারত সফর করেছে সাধনার উদ্দেশ্যে। বর্তমান বিশ্ব যেখানে প্রযুক্তিগত উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, সেখানে মানুষ ক্রমশই মানসিক উদ্বেগ, একাকিত্ব ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার শিকার। এই প্রেক্ষাপটে পরমহংস যোগানন্দের শিক্ষা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশ্বজুড়ে 'মাইন্ডফুলনেস', 'মেডিটেশন' ও 'যোগ' আজ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার পেছনে পরমহংস যোগানন্দের জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, দেখি এক আশ্চর্য মানসিক শক্তির ইতিহাস। তিনি কেবল একজন সাধক ছিলেন না—তিনি ছিলেন ভারতীয় আত্মিক ঐতিহ্যের বিশ্বদূত। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল যুক্তিনির্ভর, সার্বজনীন ও মানবকেন্দ্রিক। তিনি বিশ্বজুড়ে এমন এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার শিকড় প্রোথিত ভারতে, কিন্তু ডালপালা বিস্তৃত গোটা মানবজাতির চেতনায়। □

‘এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬’-এ আপত্তি কেন?

সুদীপ্ত গুহ

গত ১২ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই লোকসভায় পেশ করেন ‘দ্য ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’। বিরোধীদের প্রবল বাধায় বিলটিকে ৩১ সদস্য-বিশিষ্ট যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি-তে পাঠানো হয়।

৩১ জনের মধ্যে ২১ জন লোকসভার সদস্য এবং ১০ জন রাজ্যসভার সদস্য থাকবেন। বিলটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কমিটির কাজকর্মের সময়সীমাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনের মধ্যে কমিটিকে বিস্তারিত আকারে স্ক্রুটিনি রিপোর্ট জমা করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলটির মাধ্যমে বিদেশি তহবিল, সেই তহবিল-জাত সম্পদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং এইসবের ওপর নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘দ্য ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০১০’ বা বৈদেশিক অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১০-কে সংশোধন করা হবে। বিরোধী দলগুলি-সহ তথাকথিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের দ্বারা পরিচালিত কিছু সামাজিক সংগঠন প্রস্তাবিত বিলটির কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারার বিষয়ে আপত্তি তুলেছে। বিদেশি অর্থায়ন-জাত সম্পদ বেআইনি হিসেবে প্রমাণিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষকে সেগুলির ‘রেট্রোস্পেক্টিভ ভেস্টিং’-এর ক্ষমতা প্রস্তাবিত বিলের একটি ধারানুযায়ী দেওয়া হয়েছে। সংসদে বিরোধীদের দাবি যে, এই ধারাগুলি ‘বিতর্কিত’ এবং প্রচণ্ড কঠোর। সরকারপক্ষ বিরোধীদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। সংসদে সরকারপক্ষ জানিয়েছে যে, বিলটি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তৈরি হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, বিলটিকে জেপিসি-তে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো বৃহত্তর ঐকমত্য সাধন এবং আলোচনার মাধ্যমে সব দাবিদাওয়ার গঠনমূলক সমাধান।

রাজ্যবাসীর অধিকাংশ আজ একটি বিষয়ে অবগত। কার্তিক ব্যানার্জির স্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির ভ্রাতৃবধূ তথা ডাঃ অভয়া হত্যাকাণ্ডে নাম জড়ানো কুখ্যাত আবেশ ব্যানার্জির মা ‘সমাজসেবা’ করে কয়েক কোটি টাকার মালকিন হয়েছেন। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? সমাজসেবাও করলেন, আবার কোটিপতিও হলেন? সেই রাস্তা তো রয়েছে। ধরুন, কয়েকজন মিলে একটা এনজিও তৈরি করলেন। এবার বিদেশ থেকে দানগ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। এফসিআরএ পারমিশন জোগাড় করলেন। বিদেশ থেকে এলো অঢেল ফান্ড। কিছু লোকজনকে ১০০ টাকার খাইয়ে এক হাজার টাকা বিল করলেন। শীতকালে ১০০টা শাল বা কম্বল বিলি করে ১০ হাজার কম্বল বিলির হিসাব দেখালেন। সঙ্গে তৈরি করলেন বাড়ি। কিনলেন গাড়ি। পাঁচ বছর পর বন্ধ করে দিলেন সেই এনজিও। বাড়ি-গাড়ি সব হয়ে গেল তাদের— যারা ছিলেন সেই এনজিও-র স্রষ্টা। আর এখানেই সমস্যা প্রস্তাবিত বিলে। কেন্দ্রীয় সরকার এখন এফসিআরএ-র অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যরকম নিয়ম প্রণয়ন করতে চাইছে। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী— দানধ্যান বা এনজিও-র কার্যকলাপ বন্ধ করলে ওই সব সম্পত্তি চলে আসবে সরকারের মালিকানায়। দান-খয়রাতিজাতীয় সমাজসেবামূলক কাজের জন্য বিদেশ থেকে যে পরিমাণ অর্থ এনজিও-গুলি পাবে— তার ৮০ শতাংশ তাদের দান করতে হবে। আর বাকি ২০ শতাংশ অর্থে চলবে সংস্থাগুলির প্রশাসনিক খরচ। নতুন বিলটি আইনে পরিণত হলে কে, কোন খাতে, কত দান করল, তার কী খরচ করা হলো— সেসবের

> ‘এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬’-এ রয়েছে, বৈদেশিক অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে সেটা সরকারি কর্তৃপক্ষকে নিয়মমাফিক জানাতে হবে। কোনো এনজিও সেই অর্থ আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে কালো টাকা সাদা করতে পারবে না।

ফঃ ৫

পূর্ণাঙ্গ হিসাব চাইবে কেন্দ্র।

এবার হয়তো কিছুটা বোঝা গেল যে, কাজরী দেবী কীভাবে কোটিপতি হলেন। এমন কোটিপতি কিন্তু এরাজ্যের বহু লোকের আশেপাশে ঘুরছে। কিন্তু এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পাশ হলে এরা খাবেন কী, আর সমাজসেবা কীভাবে করবেন? অদ্ভুত একটি প্রশ্ন তুলেছেন বামপন্থী ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের তুতো ভাই করণ থাপার। তার যুক্তি— বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত এত স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল যদি বন্ধ হয়, তো সেগুলি কে চালাবে? এখন প্রশ্ন হলো— যদি এনজিও বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয় তো সেই সংস্থার অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি চালাতে কে টাকা দেবে? সংস্থার আধিকারিকরা পকেটের পয়সায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবেন নাকি পকেটের পয়সায় হাসপাতাল চালাবেন? তারাও অ্যাপোলো, ফর্টিস বা টেকনো ইন্ডিয়া-র মতোই ব্যবসা করবেন ওই কলেজ বা হাসপাতালে। আর তাই প্রস্তাবিত এফসিআরএ (সংশোধনী) বিলে বলা হয়েছে যে, এইসব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে যে কমিউনিস্টরা কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোটিপতি হওয়া নিয়ে এত গলা ফাটান, তারা এখন কেন কেন্দ্র-প্রস্তাবিত এফসিআরএ (সংশোধনী) বিলের বিরোধিতায় মাঠে নেমে পড়েছেন? কারণ তাদের প্রত্যেকের ঘরে এক-একজন 'কাজরী' বসে রয়েছে। নাহলে কাজকর্ম কিছু না করে কীভাবে গোটা জীবন শাঁসেজলে অতিবাহিত করল এক-একজন কমরেড?

রাজ্য তথা দেশবাসীর অনেকেই শ্রীঅরবিন্দ, বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, বিপ্লবী বাঘা যতীন বা মাস্টারদা সূর্য সেনের নাম জানেন, কিন্তু তাঁদের সংগঠন--- 'অনুশীলন সমিতি' বা 'যুগান্তর'-এর নাম জানেন না। বহু মানুষ জানেন যে, এঁরা সকলেই হয়তো কংগ্রেসের লোক। বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সিরিয়াল বানাতে কেন বহু ফেজ টুপি পরা বিপ্লবীদের বারবার দেখাতে হয়? কারণ মার্কিন ও সোভিয়েত প্রভুদের অর্থে পোষিত বিভিন্ন সংস্থার প্রচারযন্ত্র— বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর মিডিয়া; পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শিক্ষাজগৎ এবং দেশের সংস্কৃতিজগৎকে অর্থ দিয়ে সেই কাজটা করায় ভারতীয়দের মাথায় ভারতের মিথ্যা ইতিহাস ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। টলিউড-বলিউডের বহু সিনেমায় হিন্দুদের জাতপাত নিয়ে ব্রাহ্মণদের পিণ্ডি চটকানো হয়েছে, কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যে নানারকমের জাতিভেদ রয়েছে সেটা কখনও কোনো সিনেমা বা থিয়েটারে দেখানো হয় না কেন? অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তার স্ত্রী ছিলেন সরকারি কর্মচারী, অথচ তাদের এনজিও এত টাকা কোথায় পেল? তাদের পার্টি এক ফান্ড কীভাবে পেল? তামিলনাড়ুতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে গেলেই একদল লোক মৎস্যজীবীদের ত্রাতা সেজে প্রতিবাদ করে, নর্মদা ব্যারেজ বা সর্দার সরোবর নদীবাঁধ প্রকল্প তৈরির সময় একদল লোকজনের প্রতিবাদ আন্দোলন তৈরি হয়, ই-২০ পেট্রোল ব্যবহার করলে একদল পরিবেশবিদ আন্দোলন শুরু করে। কেন? ঠিক যে কারণে মেঘনাদ সাহা, হোমি জাহাঙ্গির ভাবা ও অন্যান্য অনেক পরমাণু বিজ্ঞানীর রহস্য মৃত্যু হয় ঠিক সেই কারণে। ভারতকে প্রতিরক্ষা ও শক্তিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে না দেওয়া হলো বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্য। কাদের স্বার্থে পরিচালিত হয় বিদেশি শক্তির মদতপুষ্ট 'এনজিও' নামধারী এইসব সংস্থা? ভারতের আমলাতন্ত্র, বিচারবিভাগ, কর্পোরেট জগৎ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতিজগৎ বা রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের একাংশের সঙ্গে কেন প্রত্যক্ষ- পরোক্ষভাবে বারবার সামনে আসে ফোর্ড ফাউন্ডেশন বা জর্জ সোরোসের বিভিন্ন সংস্থার যোগাযোগ? আবার তাদেরই মধ্যে কোনো সংস্থা 'ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড' স্পনসর করে। কীভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো একজন আমলা সেই পুরস্কার পায়? বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠানগুলির (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের) তালিকা হলো 'কিউ-এস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং'। সেই 'কিউ-এস র‍্যাঙ্কিং' ভালো করতে হলে কেন লিবারেল আর্টস্ পড়াতে হবে আইআইটি-র মতো ইনস্টিটিউটকে? কারা এই 'কিউ-এস র‍্যাঙ্ক'কে প্রভাবিত করে? কোন কোন অধ্যাপকের নামে-বেনামে এনজিও আছে এবং তারা কীভাবে এই এনজিওগুলির পিছনে এত সময় ও অর্থ খরচ করতে পারেন?

'দ্য এফসিআরএ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬'— এক মহৌষধ যা সব রোগের সমাধান : বিদেশি অনুদান গ্রহণ ও তার ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬'-এর বিভিন্ন ধারায় কিছু নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। আগের আইনের ফাঁকফোকর তাতে অনেকটাই মুছে যেতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। প্রস্তাবিত বিলে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

(১) বিদেশি অর্থ পাওয়া এনজিও যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তাদের সব সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি হয়ে যাবে। কয়েক বছর বৈদেশিক অর্থে সেবাকাজ পরিচালনার পর এনজিও বা বেসরকারি সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেলে সংস্থার সম্পত্তি সেই সংস্থার পরিচালনগোষ্ঠী বা কয়েকজন ব্যক্তির হয়ে যাবে না।

(২) বৈদেশিক অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে সেটা সরকারি কর্তৃপক্ষকে নিয়মমাফিক জানাতে হবে। কোনো এনজিও সেই অর্থ আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে কালো টাকা সাদা করতে পারবে না।

(৩) বৈদেশিক অনুদানের ২০ শতাংশের বেশি অর্থ সংস্থা পরিচালনা ব্যয়ের খাতে খরচ করা যাবে না। কোনো সংস্থা যে উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করে থাকে এবং যে উদ্দেশ্যে সে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করেছে, সেই উদ্দেশ্যেই বৈদেশিক অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগ খরচ করতে হবে।

(৪) এনজিও-তে কর্মরত সকলের নাম ও পরিচয় কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় বিদেশি অনুদান গ্রহণ সংক্রান্ত আইন এর থেকেও কড়া এবং এই ধরনের উন্নত দেশগুলিতে সেইসব আইন বহু দিন ধরেই কার্যকর রয়েছে। চীনের আইন তো অত্যন্ত কঠোর। অথচ ভারতে এই ধরনের বিদেশি অর্থে সংবাদপত্রের মালিক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমলা, বিচারক, চিকিৎসক, সিনেমার পরিচালক— সকলকে প্রভাবিত করে চলেছে নানা আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন। এখানেই বাধা হতে চলেছে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬।

ভারতীয় সংসদে এই বিল পাশ হোক তা চায় না দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহল। এ কারণে গত জুন-জুলাই মাসে অস্ত্র হিসেবে তুলে আনা হয়েছে আরশোলাদের। নিট (ইউজি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চাওয়া ছিল একটা বাহানা মাত্র। অনেকটা ২০১৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হোক কলরব' আন্দোলনের মতো। উপাচার্য ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী বামপন্থী চোরদের ধরছিলেন। বামপন্থী অধ্যাপকরা ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগিয়ে একটা শ্লীলতাহানির কেস এনে তাঁকে উপাচার্য পদ থেকে সরিয়ে কুখ্যাত শিক্ষা-মাফিয়া সুরঞ্জন দাসকে উপাচার্য পদে বসালেন। এটাই ছিল 'হোক কলরব' আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য।

ককরোচ জনতা পার্টির সাম্প্রতিক আন্দোলন কি শুধুই এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল আটকানোর জন্য? নাকি আরও কিছু কারণ রয়েছে? অবশ্যই বড়ো কারণ হলো ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের স্বাক্ষর না করা। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা চুক্তির প্রস্তাব কেন? সবার হয়তো মনে রয়েছে গ্যাট চুক্তি ও ডাঙ্কেল প্রস্তাবের কথা। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-এ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সিপিএম তখন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রচার করে। ১৯৯১-এর লোকসভা ভোটে ২৪৪টি আসনে জয়ী কংগ্রেস ১৯৯৬-এর লোকসভা নির্বাচনে ১৪০টি আসন পায়। সেই চুক্তিতে পৃথিবীর সব দেশকে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে আমেরিকা। কিন্তু এই চুক্তিতে লাভ হয় চীন ও ভারতের। তিন দশক পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বোঝে এই চুক্তিতে তাদের কোনো লাভ হয়নি, তখন তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পৃথক বাণিজ্য চুক্তি করা শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেই আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। এবং অবশ্যই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হওয়া সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলিতে আমেরিকা নিজের দিকেই ঝোল টানে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি হলেও আমেরিকা প্রস্তাবিত এই চুক্তিতে রাজি হয়নি বর্তমান ভারত সরকার। কারণ এই চুক্তিতে ভারতীয় কৃষক, গোপালক, মৎস্যচাষী, পশুপালক ও পোল্ট্রি মালিকরা পড়বেন বিপদে। তবে লাভ অবশ্যই হবে শিল্পের। শহরাঞ্চলের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীদের লাভ অবশ্যই হবে। বর্তমানে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙেগ একটা সাময়িক চুক্তি করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছে। কিন্তু বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে ভারতের শিক্ষা-গবেষণা- পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হবে।

এ.আই.-এর প্রভাব-সহ নানা কারণে ভারতের আইটি (তথ্য-প্রযুক্তি) শিল্পে ধস নামায় শহুরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্প্রতি এক ধরনের অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সেই সব সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের যাঁরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে বহু টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এমতাবস্থায় কর্মক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হলে বা চাকরি চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। আর ঠিক এই জনগোষ্ঠীই হলো এই মুহূর্তে বিভিন্ন বিদেশি এজেন্সির মূল টার্গেট। মূলধারার সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এই জনগোষ্ঠীকেই ক্ষ্যাপাচ্ছে সিআইএ তথা আমেরিকা। এজেন্সিগুলি মনে করছে যে, পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মরত এই শ্রেণী যদি ভারত সরকারের ওপর চাপ দেওয়া শুরু করে, তাহলে চাপে পড়ে ভারত সরকার এই চুক্তি মেনে নেবে।

কিন্তু ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম— নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। এর আগে মোদীজী চীনের সঙ্গে এমনই একটি বহুজাতিক বাণিজ্য চুক্তি এড়িয়ে যান। ভারতের কৃষক, গোপালক, পশুপালক, মৎস্যচাষি ও পোল্ট্রি মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আরেক দল ভারতীয়ের সুখ কিনবেন না মোদীজী। বর্তমান ভারত চীন বা সৌদি আরব নয়। এটা এক নতুন ভারত। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬— পশ্চিমবঙ্গের সব দেওয়ালে ডাঙ্কেলের কার্টুন এঁকে সংসদে সিপিএম ডাঙ্কেল প্রস্তাবকে চোরের মতো সমর্থন করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সব কাজ পরিচালিত হচ্ছে প্রকাশ্যে। তাই ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি ভারতের শর্তে হবে। ততদিন বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) হয়তো আবার কিছু লোককে ক্ষ্যাপাবে। আর সেটা গোটা দেশকে মোকাবিলা করতে হবে আরেক বার। কিন্তু গ্রামের মানুষের স্বার্থহানি কিছুতেই করতে দেবে না বর্তমান ভারত সরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের পর দেশকে অশান্ত করে তোলার লক্ষ্যে বারবার সংঘটিত হয়েছে নানা আন্দোলন। সিএএ আইনের বিরোধিতা করে শাহিনবাগ আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের মুখোশের আড়ালে খালিস্তান আন্দোলন, ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক সিজেপি আন্দোলন— দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পোশাক পরিবর্তন করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে ভারত-বিরোধী শক্তি। রাষ্ট্রবিরোধী, টুকরে টুকরে গ্যাংদের এইসব আন্দোলনের পিছনে চলেছে ঢালাও বিদেশি অর্থের প্রবাহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন পশ্চিমি দেশ-স্থিত গ্লোবাল ডিপস্টেটের অঙ্গুলি হেলনে চলেছে ভারতের বুকে বাংলাদেশ ও নেপালের কায়দায় 'কালার রেভোলিউশন'-এর ছক। বিদেশি অর্থ সরবরাহের লক্ষ্য শুধু ভারতকে অস্থির করে তোলা বা তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতে 'রেজিম চেঞ্জ' নয়। ভারত জুড়ে মাদক, অস্ত্র, বন্যপ্রাণ, গোসম্পদ, নারী ও শিশু পাচার, চোরাচালান-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে স্কুল-কলেজ, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনার আড়ালে ধ্বংসাত্মক, জেহাদি চিন্তাধারা প্রচার, মগজধোলাই, ল্যান্ড জেহাদ, পরিবেশ আন্দোলনের নামে খনিজ সম্পদ উত্তোলন-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন আটকে দেওয়া, ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গতিরোধ করা এবং ধর্মান্তরণের অবৈধ চক্র পরিচালনা হলো এই বিদেশি অর্থ সরবরাহের উদ্দেশ্য। সংসদে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল পাশ হলে এই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বাড়াভাতে ছাই পড়ার সম্ভাবনা। এই বিলটি আইনে পরিণত হলে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন এনজিওগুলির পক্ষে বিদেশি অর্থ প্রাপ্তি এবং

তার ব্যবহার অনেকটাই মুশকিল হয়ে উঠবে।

গত ১৬ মে অনলাইনে, সামাজিক মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর নিট (ইউজি) প্রশ্নপত্র ফাঁস ও এই সংক্রান্ত অব্যবস্থার প্রতিবাদে ভারতের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম বা জেনারেশন জেড (সংক্ষেপে 'জেন-জি') দ্বারা পরিচালিত ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে শুরু হয় গত ৬ জুন। তাদের দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। আম আদমি পার্টির পূর্বতন কর্মী অভিজিৎ দিপকে-র দ্বারা সংগঠিত এই সিজেপি আন্দোলনে যোগ দিতে বহু এনআরআই (প্রবাসী ভারতীয়) দিল্লি এসে পৌঁছান। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যারা নিজেদের বৃদ্ধ, অসুস্থ পিতা-মাতাকে দেখতে এত বছর ধরে দেশে আসেননি, তারাও দিল্লিতে হোটেল বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন আগামী কয়েক মাসের জন্য। কিন্তু কেন? তাদের স্বার্থ কী? এখানে বিদেশে কর্মরত ও প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশ কীভাবে ঘুষ খায় সেই পদ্ধতিটা সকলকে জানাতে হবে। ওই সব দেশে আইন অত্যন্ত কঠিন। বিচারব্যবস্থাও বেশ কড়া। খাটের তলায় নোট বা সোনার গয়না রাখলে জেল-জরিমানা হবেই। কিন্তু তাই বলে দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রের একশ্রেণীর ভারতীয়দের ঘুষ খাওয়া থেকে আটকানো যায়? ধরা যাক, আমাজন বা অ্যাপ্‌লের কোনো উচ্চপদস্থ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইঞ্জিনিয়ার একটা ছোটো সফ্টওয়্যার কোম্পানি বা কোনো ভারতীয় সফ্টওয়্যার কোম্পানিকে আউটসোর্সিঙের একটা টেন্ডার দিল। এর পরিবর্তে সে ১ শতাংশ ঘুষ নেবে। তার চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এটা তার জন্মগত অধিকার! সে ওই ছোটো কোম্পানি বা ভারতীয় কোম্পানিকে বলল তার ভাগ্যনগর, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই, চেন্নাই বা লুধিয়ানার কোনো এনজিও-কে ওই ১ শতাংশ ঘুষের অর্থ অনুদান হিসেবে দিতে, যে অর্থ সে ঘুরিয়ে আবার যে পশ্চিমি দেশে কর্মরত, সেই দেশে নিয়ে যাবে। এভাবে কালো ডলার সাদা টাকা হয়ে প্রথমে পৌঁছায় গ্রামের বাড়িতে। তারপর আবার সাদা ডলার হয়ে বিদেশে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই সংসদে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল এনেছে। বিরোধীদের প্রবল আপত্তিতে সেই বিল এখন জেপিসি-র পর্যালোচনাধীন। এই বিলে বলা হচ্ছে বিদেশ থেকে কোনো এনজিও-তে কেন অর্থ আসছে এবং কোন খাতে তা খচর হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ জানাতে হবে ভারত সরকারকে। ব্যাস্! এইবার মাথায় পড়েছে হাত! সিজেপি আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনশন শুরু করেছিলেন সোনম ওয়াঙচুক। তার সমস্যাও একই। কারণ সোনম প্রকৃতপক্ষে কোনো বিজ্ঞানী নন এবং 'থ্রি ইডিয়টস্' সিনেমার মূল চরিত্র রণছোড়দাস শ্যামলদাস চাঁচড় বা র‍্যাঞ্চো-র মতো কোনো পেটেন্ট নেই তার। যে অর্থে তার সংস্থা পরিচালিত হয়, তার পুরোটাই আসে বিদেশ থেকে। বিদেশি প্রভুদের দেওয়া ম্যাগসাইসাই পুরস্কারও গিয়েছে তার ঝুলিতে। এবার এই ধরনের লোকজন সবাই মিলে হাত মিলিয়েছে। নয়াদিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তাঘাটে বেরিয়ে এসেছে আরশোলারা।

১৯৮২ সালে বালিগঞ্জের বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যার আগে এরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম রটানো শুরু করে যে আনন্দমার্গী মানেই ছেলেধরা। সিপিএমের লক্ষ্য ছিল যাতে মানুষের সমর্থন না পায় আনন্দমার্গীরা। এরপর একদিন কমিউনিস্ট হার্মাদরা সংঘটিত করে সেই ভয়ংকর গণহত্যা। গণহত্যার পর সিপিএম বহুদিন সেই প্রচার চালিয়ে যায় যাতে বিচার না পায় আনন্দমার্গী সাধুরা। সেই এক খেলা খেলছে আজকের বামপন্থীরা। গদি মিডিয়া, গদি মিডিয়া বলে বারবার আক্রমণ করে যাচ্ছে জুনিয়র সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী ইউটিউবারদের। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মিডিয়া হাউজের মালিক আর সাংবাদিক কিন্তু এক নয়। মিডিয়া হাউজের মালিকরা প্রেস ক্লাবকে পাত্তাই দেয় না। সম্প্রতি আরশোলাদের দ্বারা বেশ কয়েকবার সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আর তারপর আরশোলাদের আন্দোলনের খবর সংগ্রহ বয়কট তো দূরের কথা, সেই সব মিডিয়া হাউজ আরও বেশি করে যারা কর্তব্যরত সাংবাদিকদের আক্রমণ করেছিল, তাদের হয়ে ন্যারেটিভ তৈরি করেছে; অসম্মান করেছে তাদেরই সাংবাদিকদের এবং নিজেদের মিডিয়ায় সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছে সাংবাদিক নিগ্রহের সেই খবর।

প্রশ্ন হলো--- আজ এই আরশোলা আন্দোলন কাদের দৌলতে এই স্তরে উঠেছে? তথাকথিত 'গদি মিডিয়া' যদি সব হতো, তাহলে এই আরশোলা আন্দোলনের খবর কেউ জানতেই পারতো না। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন বা আন্না হাজারের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের সঙ্গে ধারে বা ভারে কোনোভাবেই দাঁড়াতে পারে না আরশোলাদের এই চরম নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন। সবার কাছে এটা পরিষ্কার যে, প্রভাবশালী মহলের স্বার্থে ঘা পড়ার কারণেই এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল আটকাতে কিছু লোকজনকে নিয়ে সংগঠিত এরকম একটা আন্দোলনকে আজকের মিডিয়াই মাথায় তুলেছে। তাহলে কেন সাংবাদিকদের পেটানো? সবচেয়ে বড়ো কথা--- আরশোলাদের দ্বারা এই সাংবাদিক নিগ্রহের পর তার প্রতিবাদে প্রেস ক্লাবের এই দিশাহীন আন্দোলনের কোনো প্রভাব কি সমাজের ওপর পড়েছে? কাল যদি এই সাংবাদিকদের মিডিয়া হাউজ তাদের নির্দেশ দেয়, সাংবাদিক পেটানি নিয়ে কোনো খবর না করতে, তখন কে মনে রাখবে প্রেস ক্লাবের প্রতিবাদ? গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার দেখা গেল যে কীভাবে মিডিয়া হাউজগুলো তাদের সাংবাদিকদের ওপর সংঘটিত হামলার খবর চেপে দেয়। মিডিয়া মালিকরা এবারও হয়তো এই ঘটনার খবর চেপে যাবেন। বিগত শতাব্দীর ৮০-র দশকে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীরা অসহায় ছিলেন সিপিএমের দ্বারা ব্রেনওয়াশ হওয়া সমাজ ও সিস্টেমের কাছে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ তথা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ তাঁদের পাশে ছিল।

সাংবাদিকদের দুর্ভাগ্য তাঁদের মালিকরা তাঁদের পাশে থাকছেন না। প্রেস ক্লাবের বর্তমান নেতৃত্বের কাছে শেষ প্রশ্ন হলো— তাঁরা কি রাজি হবেন যদি আগামীদিনে সিজেপি আন্দোলন সম্পূর্ণ বয়কট করার ডাক দেন সাংবাদিকরা? কার/কাদের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করলেন? এইসব করে কাকে/কাদের তারা বোকা বানালেন? □

হেলেন নেলসেনের গল্প অবলম্বনে নাটক
উইটনেস

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালি সংস্কৃতি যেমন বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে মিলেমিশে গেছে ব্রিটিশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই। পাশ্চাত্য সুরে মোহিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতে, ভারতীয় রাগ তালের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হুবহু অনুবাদ নয়, ভাবটাও নাও'। মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট পাওয়া যায়। বিদেশি সাহিত্য নিয়ে নাটক বাঙ্গালি রঙ্গমঞ্চ আলো করেছে বহু আগেই। ১৭০২ সালে মঞ্চস্থ ইংরেজ নাট্যকার নিকোলাস রো'র বিখ্যাত নাটক 'দ্য ফেয়ার পেনিটেন্ট' নিয়ে ১৮৫৬ সালে শ্যামাচরণ দাস দত্ত অনুবাদ করেছিলেন 'অনুতাপিনী নবকামিনী'। ১৮৭২ সালে স্কটল্যান্ডের কবি ওয়াল্টার স্কটের আখ্যানমূলক কবিতা 'লেডি অব দ্য লেক' অবলম্বনে 'সরোসুন্দরী' মঞ্চস্থ হয়। ওই একই কবিতা নিয়ে কালীপদ ভট্টাচার্য্যের নাট্যরূপে বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৪ সালের ৭ মার্চ অভিনীত হয় 'প্রভাবতী'। হেনরি ফিল্ডিং-এর লেখা রহস্য উপন্যাস 'টম জোনস'-এর নাট্যরূপ দেন গোপালচন্দ্র নাথ এবং মহেশচন্দ্র দাস দে। ১৮৩৬ সালে তা মুদ্রিত হয়। অনুবাদ নাটকের এত বিস্তৃত বিবরণ এই কারণেই যে বহুদিন ধরেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বিদেশি নাটক ভারতীয় ভাবে অভিনীত হয়ে চলেছে। গিরিশচন্দ্র থেকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিভাস চক্রবর্তী হয়ে আজকের নাট্যকারেরাও দেশীয় গল্পের পাশাপাশি বিদেশি গল্পকে অবলীলায় দেশীয় মোড়কে ফেলে চমৎকার কাজ করে চলেছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হলো 'থেসপিয়ানস' প্রযোজিত নাটক 'উইটনেস'। হেলেন নেলসেনের গল্প অবলম্বনে এই নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছেন জিৎ সত্রাগ্নি, পরিচালনা করেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। নাটকটির কোনো বাংলা নাম হতে পারতো, হতে পারতো সাক্ষী। কিন্তু তা না করে 'উইনেস' নাম রেখে এর বিদেশি ভাবকে বজায় রাখা হয়েছে এই ভেবে হয়তো পাশ্চাত্যের অনুকরণে আইনের শাসন কখনো কখনো বিভ্রান্তি তৈরি করে। সাদা চোখে যা সত্য বলে মনে হয় অনেক সময় তা সত্য নাও হতে পারে। আচার্য 'চাণক্য নীতি'তে বলা হয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই একটি মঙ্গলকামী দেশের পরিচয়। এই নাটকে আইনের কাঠগড়ায় সত্য-মিথ্যার এক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো হয়েছে চমৎকারভাবে।

আইনজীবী শীর্ষ চ্যাটার্জীর চরিত্রে নাট্যকার পার্থ মুখোপাধ্যায় বাক্‌পটুত্ব এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সত্যপ্রিয় পাঠকের চরিত্রে শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় নাটকের সুর বেঁধে রাখতে পেরেছে। অন্যান্য অভিনয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা চট্টোপাধ্যায়, পায়েল গাঙ্গুলী, রোজি রায়, তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্ত হাজরা, কল্যাণ বর্মণ, মৌসুমী আদক, উজ্জ্বল চক্রবর্তী প্রমুখ যথাযথ অভিনয় করেছেন। বাবলু সরকারের আলো এবং অবশ্যই কল্যাণ সরকারের আবহ নাটকের দৃশ্যপটের প্রতি মুহূর্ত তৈরি করতে সাহায্য করেছে। নাটক এভাবেই চলুক। রবীন্দ্রনাথ বলেইছেন— 'দিবে আর নিবে মিলাবে যাবে না ফিরে— এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' □

অনুগল্প

আশীর্বাদ

বৌভাতের পরের দিন। তখনও বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ আছেন। সবাই আবদার করল এবার প্রেজেন্টেশনগুলো খোলা হোক। দেখা যাক কে কী দিয়েছে।

সেইমতো একটি বড়ো ঘরে সবাই জড়ো হলো। উপহারগুলো ঘরের চৌকির উপর রাখা হলো। সবাই এমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন আলিবাবার গুপ্ত গুহায় বস্তা খুলে মোহর ঢালা হচ্ছে।

উপহারের প্যাকেটগুলো একে একে খোলা হচ্ছে। কে কোন উপহার দিয়েছে তার নাম ধাম খুঁজে না পেলে অনুমান করার চেষ্টা চলতে লাগল। পছন্দ না হলে সম্ভাব্য ব্যক্তির উদ্দেশে কটূক্তি চলতে লাগল। বিশেষ, করে যে আত্মীয়রা নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে, তাদের নামে।

সবাই সবার শত্রুপক্ষের নাম ধরে বলতে লাগল— 'দাঁড়া, এবার ওর বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হোক, নতুন প্যাকেটে ভরে এটাই একে রিটার্ন দেওয়া হবে। ও যেমন বুনো ওল, আমরাও তেমনই বাঘা তেঁতুল।'

এমন সময় একটি প্যাকেটের আবরণ উন্মোচন করে দেখা গেল তাতে শুধু নিমন্ত্রণপত্রটি রাখা আছে। অর্থাৎ যে কার্ডের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেই কার্ডটিই একটি সুন্দর প্যাকেটে ভরে প্রেজেন্টেশন হিসেবে ফেরত দেওয়া হয়েছে। কার্ডের যেখানে লেখা ছিল— ' নবদম্পতির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনীয়', সেই লাইনটি লালকালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা।

দেখামাত্রই গালিগালাজের বন্যা বয়ে গেল। 'কোন হাড়কিপ্টে কে জানে! নিমন্ত্রণপত্রটাই ফেরত দিয়ে গোষ্ঠীসমেত খেয়ে গেল।' রাগ হলেও ভাবলাম লোকটা বেশ রসিক বটে।

এদের উচিত শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি উৎসুক হয়ে প্যাকেটটি হাতে নিয়ে দেখি, কার্ডের নীচে একটি কাগজের চিরকুট রাখা আছে। তাতে লেখা— 'প্রেজেন্টেশনের ওপর যখন এতই লোভ তখন ঘটা করে নবদম্পতির জন্য আশীর্বাদ চাইবার কী দরকার ছিল?'

অজয় ভট্টাচার্য

জাতীয় উদ্যান

পাপিকোন্ডা

পাপিকোন্ডা জাতীয় উদ্যান অন্ধ্র প্রদেশের পোলাভরম ও এলরু জেলার পাপি পাহাড়ে অবস্থিত। এই উদ্যানের বুক চিরে বয়ে গেছে গোদাবরী নদী। এটি ১০১২.৮৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ১৯৭৮ সালে এটিকে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০৮ সালে জাতীয় উদ্যান রূপে ঘোষিত হয়। এই উদ্যানে বাঘ, চিতাবাঘ, হায়না, এবং নানা ধরনের দুর্লভ পাখি রয়েছে। বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে এই উদ্যানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাখি ও জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় হলো অক্টোবর থেকে মে মাস। এই উদ্যান যে স্থানে অবস্থিত অতীতে এটি বানরদের কিষ্কিন্ধ্যা নামক রাজ্য ছিল।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৬

विशिष्ट सम्बोधनम् - स्त्रीलिङ्गे
(भाग:-३)

भो:! बालिके! (ওহে বালিকা!)

श्रीमति!

मान्ये!

मान्यवरे!

महाशये!

आर्ये!

महोदये!

सुधी:!

सखि!

(এভাবে এরকম বিশিষ্ট সম্বোধন পদ দিয়ে বাক্য রচনা করা যায়। যেমন--भो:! बालिके! (ওহে বালিকা!)

ভালো কথা

লালু

একমাস হলো বাবা স্কুল থেকে ফেরার পথে একটি লাল রঙের কুকুরছানা বাড়িতে এনেছে। বাবা বলল কেউ ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে। খুবই ছোটো আর ওজনও খুব কম। ঠাকুমা প্রথম কদিন ঝিনুকে করে দুধ খাইয়ে দিয়েছে। এখন নিজে নিজেই খেতে পারে। এই কদিনেই বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছে। ঠাকুমা ওটার নাম রেখেছে লালু। আগে ওটার গায়ে খুব উকুন ছিল। বাবা কুকুরের গায়ে মাখার সাবান কিনে এনেছিল। ঠাকুমা ওটা দিয়ে খুব ভালো করে স্নান করে দেওয়ার পরে আর উকুন নেই। রাতে লালু ঠাকুমার বিছানাতেই শোয়।

শিবানী সেন, অষ্টম শ্রেণী নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মা আসছে

সায়ন দাস, একাদশ শ্রেণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

আসছে পূজা
খুবই মজা
প্যান্ডেল বাঁধা চলছে,
কাঠামো সব পারিপাটি
প্রতিমা সব একমাটি
মা আসছে সবাই কিন্তু বলছে।

কখনো রৌদ্র
কখনো বৃষ্টি
আবহাওয়া খুবই মিষ্টি,
পুকুর জলে শালুক ফুল
নদীর পাড়ে কাশফুল
অপরূপ সাজে সেজেছে সৃষ্টি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বিচার যদি মানুষের অধিকার হয়, তাহলে সেই বিচার পাওয়ার পথও মানুষের নাগালের মধ্যে থাকা উচিত। আর সেই কারণেই কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চের দাবি শুধু পশ্চিমবঙ্গের দাবি নয়— এটি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের সহজ, সুলভ ও মর্যাদাপূর্ণ বিচার পাওয়ার অধিকারের দাবি।

কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চ—সময়ের দাবি

জ্যোতি চ্যাটার্জী

ন্যায়বিচার মানুষের অধিকার। কিন্তু সেই ন্যায়বিচারের দরজায় পৌঁছতে যদি একজন সাধারণ মানুষকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে যেতে হয়, দিনের পর দিন সময় দিতে হয় এবং নিজের সামর্থ্যের তুলনায় বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, তাহলে বিচারব্যবস্থাকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা কি জরুরি নয়? এই প্রশ্ন থেকেই কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিটি সামনে আসে। এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের দাবি নয়; এটি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের বিচার পাওয়ার পথকে আরও সহজ, সুলভ ও নাগালের মধ্যে দিয়ে আসার দাবি।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আসন দিল্লিতে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনো সাধারণ মানুষকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে যেতে হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। যাতায়াতের খরচের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা, খাওয়া, স্থানীয় পরিবহণ এবং বারবার শুনানিতে উপস্থিত থাকার ব্যয়। একজন সাধারণ পরিবারের কাছে এই খরচ অনেক সময় মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেই বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

একজন মানুষ হয়তো বহু বছর ধরে ন্যায়ের আশায় আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে দিল্লি যাওয়া শুধু একটি ভ্রমণ নয়— এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থের চাপ, সময়ের অপচয়, কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি এবং পরিবারের উপর বাড়তি দায়িত্ব। বিচার পাওয়ার পথ যদি ভৌগোলিক দূরত্ব ও আর্থিক সামর্থ্যের উপর এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে আরও মানুষের কাছে নিয়ে আসার কথা ভাবা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ ন্যায়বিচার শুধু আদালতের রায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই রায়ের জন্য আদালতের দরজায় পৌঁছনোর সুযোগটাও ন্যায়বিচারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই জায়গাতেই কলকাতার গুরুত্ব সামনে আসে। কলকাতা দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও আইনকেন্দ্র। কলকাতা হাইকোর্টের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কলকাতার আইনি ও প্রশাসনিক যোগাযোগও বহু পুরনো। ফলে পূর্বাঞ্চলের জন্য সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চের কথা উঠলে কলকাতাকে কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

সাংবিধানিকভাবেও কি এর সুযোগ রয়েছে? এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে ভারতের সংবিধানের ১৩০ নম্বর অনুচ্ছেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের আর্টিকেল ১৩০ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্ট দিল্লিতে বসবে। তবে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে সময়ে সময়ে অন্য কোনো স্থান বা স্থানগুলিকেও সুপ্রিম কোর্টের বসার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করতে পারেন। অর্থাৎ সংবিধান সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রমকে শুধুমাত্র দিল্লির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি।

এই সাংবিধানিক সুযোগের কারণেই কলকাতায় একটি আঞ্চলিক বেঞ্চের দাবি নিয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

ফ ঃ ৬

অবশ্যই এর জন্য নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আর্টিকেল ১৩০-এ দিল্লির পাশাপাশি অন্য স্থানেও সুপ্রিম কোর্ট বসার সুযোগ রাখা হয়েছে।

আর এই ধারণাটি একেবারেই নতুন নয়। ২০০৯ সালে Law Commission of India-এর ২২৯তম রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টের বিচারব্যবস্থাকে আরও বিকেন্দ্রীকৃত করার একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। লেখানে দিল্লিতে একটি Constitution Bench রাখার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চারটি আঞ্চলিক Cassation Bench গঠনের সুপারিশ করা হয়। পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্র ছিল কলকাতা।

সেই প্রস্তাবিত পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, অসম, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্য ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ কলকাতাকে পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করার যুক্তি আজকের নয়; এর পেছনে বহু বছর আগের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুপারিশও রয়েছে। যদিও সেই সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি এবং ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্ট তা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তবুও সময়ের সঙ্গে দেশের বাস্তবতা অনেক বদলেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে, মামলার সংখ্যা বেড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং বিচারব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহারও বহুগুণ বেড়েছে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করার দাবি উঠতেই পারে।

২০২৪ সালে আইন ও বিচার সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে পেশ হওয়া 'জুডিশিয়াল প্রসেসেস্ অ্যান্ড দেয়ার রিফর্ম' শীর্ষক ১৩৩তম রিপোর্টে উপরোক্ত বিষয়গুলি পুনর্বার সুপারিশ আকারে উল্লেখিত হয়।

কলকাতার অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। একটি আঞ্চলিক বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার সুফল শুধু আদালত এবং মামলাকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর সঙ্গে কলকাতার অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানেরও একটি সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচারপতি, আইনজীবী, মামলাকারী, তাঁদের পরিবারের সদস্য, আদালতের কর্মী, সাংবাদিক, গবেষক এবং অন্যান্য পেশার মানুষের কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত বাড়বে।

এর ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, গাড়ি ভাড়া, বই ও প্রকাশনা, আইনি পরিষেবা, অফিস পরিসর-সহ বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়তে পারে। এর পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। কলকাতার আইন ও পেশাগত পরিষেবা ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

পর্যটনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা এর সঙ্গে কলকাতার পর্যটন শিল্পেরও একটি পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ মামলার কাজে কলকাতায় এলে তাঁদের অনেকেই কয়েক দিন শহরে থাকবেন। কাজের পাশাপাশি তাঁরা কলকাতার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, জোড়াসাঁকো, কুমোরটুলি, দক্ষিণেশ্বর বেলুড় মঠ-সহ শহরের বহু ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থান তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে।

ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহণ এবং পর্যটননির্ভর ছোটো-বড়ো ব্যবসাগুলিও উপকৃত হতে পারে।

অবশ্যই শুধু একটি আদালত প্রতিষ্ঠা হলেই কলকাতার অর্থনীতি বা পর্যটনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে— এমনটা নয়। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি আইন, পরিষেবা, আতিথেয়তা, পরিবহণ ও পর্যটনকে ঘিরে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

এই দাবি আসলে কার? এই দাবি কোনোভাবেই 'কলকাতা বনাম দিল্লি' নয়। দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রেখেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সর্বোচ্চ আদালতের বিচার আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় কি না, সেটিই আসল প্রশ্ন।

একজন সাধারণ মানুষ যেন শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব বা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বার থেকে দূরে সরে না যান— এই ভাবনাটাই হওয়া উচিত আলোচনার কেন্দ্রে।

কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চ হলে একদিকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে দূরত্ব ও ব্যয়ের বোঝা কমতে পারে, অন্যদিকে কলকাতার আইন, পরিষেবা, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই দাবি সংবিধানের কাঠামোর বাইরে কোনো অস্বাভাবিক দাবি নয়। সংবিধানের ১৩০ নম্বর অনুচ্ছেদেই দিল্লির পাশাপাশি অন্য স্থানেও সুপ্রিম কোর্ট বসার সুযোগ রাখা হয়েছে। তাই এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক আবেগের বাইরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত আলোচনা। কারণ বিচার যদি মানুষের অধিকার হয়, তাহলে সেই বিচার পাওয়ার পথও মানুষের নাগালের মধ্যে থাকা উচিত।

আর সেই কারণেই কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চের দাবি শুধু পশ্চিমবঙ্গের দাবি নয়— এটি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের সহজ, সুলভ ও মর্যাদাপূর্ণ বিচার পাওয়ার অধিকারের দাবি। কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একটি আঞ্চলিক বেঞ্চ— এটি শুধু একটি দাবি নয়, এটি সময়ের দাবি। □

‘হিন্দু গ্রোথ রেট’ : প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে নতুন করে ফিরে দেখা এক পুরনো বয়ান

অর্থনীতির ইতিহাস ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে লেখা যায় না। দেশের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার বিচারও শেষপর্যন্ত দেশের নীতির ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। সেই কারণেই ‘হিন্দু গ্রোথ রেট’ আজ আর কেবল একটি অর্থনৈতিক পরিভাষা নয়; এটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ও ঐতিহাসিক বয়ানকে নতুন করে ফিরে দেখার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য।

জয়দীপ ভট্টাচার্য

বিশ্ব অর্থনীতি আজ এক অস্থির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। প্রথমে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত— একটির পর একটি ভূ-রাজনৈতিক সংকট আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি-নির্ভর বাণিজ্যযুদ্ধ, যার অভিঘাতে বৈশ্বিক বাজারে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত যদি কূটনৈতিক আলোচনার পরও দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে বিশ্বকে আরও গভীর অর্থনৈতিক মন্দা এবং জ্বালানি-সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। এই প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের অর্থনীতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আনুমানিক ৬.৫ থেকে ৬.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সময়ে বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আর্থিক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে প্রায় ২.১ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের আশেপাশে সীমাবদ্ধ। ফলে বর্তমান বৈশ্বিকবাস্তবতায় ভারতের এই প্রবৃদ্ধি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

ভারতের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংক— উভয় সংস্থাই সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেছে। আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি যে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে, তার পেছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিকাঠামো নির্মাণে নজিরবিহীন বিনিয়োগ, ব্যবসাবান্ধব নীতি এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ধারাবাহিক প্রয়াস। এই ধারাবাহিকতার উপর ভর করেই ভারত আগামী ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে। একই সঙ্গে স্বাধীনতার শতবর্ষে অর্থাৎ ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্নকেও বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে দেশ এগিয়ে চলেছে।

নেহরুবাদী স্থবিরতার দীর্ঘ ছায়া

কিন্তু ভারতের বর্তমান সাফল্যের মূল্যায়ন করতে গেলে স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতেই হয়। স্বাধীনতার পর পরিকল্পিত অর্থনীতি, পাঁচ-সালা পরিকল্পনা এবং ভারী শিল্পকেন্দ্রিক উন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক অচল কাঠামোয় পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনের পরিবর্তে অনুমোদন, উদ্যোগের পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিকতা— এই ছিল সেই সময়ের অর্থনৈতিক বাস্তবতা।

তার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। ১৯৯০ সালে ভারত এমন এক আর্থিক সংকটে উপনীত হয় যে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের জন্য দেশের স্বর্ণ ভাণ্ডারের একাংশ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ডের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণ সেই সংকট থেকে উত্তরণের সূচনা করলেও, তার আগের চার দশকের অভিজ্ঞতা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক সতর্কতামূলক অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

তিন দশকের মন্থর অর্থনীতি

১৯৫০ থেকে ১৯৮০ এই দীর্ঘ তিন দশকে ভারতের গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র সাড়ে তিন শতাংশের কাছাকাছি। আশির দশকে কিছুটা গতি এলেও অর্থনীতির মৌলিক দুর্বলতা কাটেনি; বরং প্রতিটি দশককে দশকের শেষে দেশকে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করতেই হয়েছিল। এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, অতিরিক্ত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতার প্রতি অনীহা, ভর্তুকিনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো এবং একচেটিয়া বাজারব্যবস্থা। উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগ-প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাগরিকের স্বাধীনতা ছিল সীমিত; মানুষ যা কিনতে পারতেন, তারও বড়ো অংশ নির্ধারিত হতো সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা।

এই চিত্র আরও বিস্ময়কর মনে হয় যখন ভারতের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক অবস্থানের কথা স্মরণ করা হয়। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভারতের দখলে ছিল। অথচ

স্বাধীনতার কয়েক দশকের মধ্যেই সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। একই সময়ে চীন দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে এগিয়ে গিয়ে ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়। আজ তার অর্থনীতির আকার ২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।

অর্থনৈতিক ব্যর্থতার দায় কার?

এই দীর্ঘ অর্থনৈতিক স্থবিরতার সঙ্গে যে অভিধাটি সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে যায়, তা হলো— 'হিন্দু গ্রোথ রেট'। বিস্ময়ের বিষয়, দেশের অর্থনৈতিক নীতির ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দায়টি শেষপর্যন্ত এসে চাপানো হলো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতনী সমাজের নামের উপর। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার; পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল সরকার; উন্নয়নের গতি নির্ধারণ করেছিল সরকার। কিন্তু ইতিহাসে বহুল প্রচারিত হলো এমন একটি পরিভাষা, যা দেশের সরকারের পরিবর্তে পরোক্ষভাবে দায়ী করল একটি সভ্যতা ও তার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে।

এই নামকরণের রাজনৈতিক তাৎপর্যও উপেক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ এবং পরে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় দেশ শাসন করেছে কংগ্রেস। অর্থনৈতিক নীতিও ছিল তাদেরই হাতে। সেই প্রেক্ষাপটে সরকারের নীতিগত ব্যর্থতার পরিবর্তে 'হিন্দু গ্রোথ রেট' শব্দবন্ধের জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নিছক অর্থনীতির ভাষা ছিল না; এর মধ্যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রবণতার প্রতিফলনও ছিল। বিশেষ তাৎপর্যের বিষয়, যে দেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে, সেই দেশেই আবার ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময় ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'সোশ্যালিস্ট' ও 'সেকুলার' শব্দ দুটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযোজিত হয়। এই বৃহত্তর রাজনৈতিক আবহের মধ্যেই 'হিন্দু গ্রোথ রেট' শব্দবন্ধ ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পায়।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর সরাসরি প্রশ্ন

দীর্ঘদিন ধরে প্রায় প্রশ্নাতীতভাবে ব্যবহৃত এই পরিভাষাকে প্রথমবার জাতীয় স্তরে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৬ সালের ১০ জুন, এনডিএ সরকারের বারো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দেশে এমন একটি ধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল যে ভারতের উন্নয়ন কখনো দ্রুত হতে পারে না। সেই মন্থর উন্নয়নেরই নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিন্দু গ্রোথ রেট'। অথচ ধীরগতির উন্নয়ন ছিল কংগ্রেস সরকারের নীতির ফল, হিন্দু সমাজের নয়। তাঁর মন্তব্য ছিল— এই পরিভাষার নাম যদি কিছু হওয়ারই থাকে, তবে তা হওয়া উচিত ছিল 'কংগ্রেস গ্রোথ রেট'।

মোদীজীর এই বক্তব্য কেবল একটি রাজনৈতিক পালটা মন্তব্য নয়; এটি স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রচলিত ব্যাখ্যাকেও নতুন করে বিচার করার আহ্বান। কারণ, অর্থনীতির সাফল্য বা ব্যর্থতার দায় শেষ পর্যন্ত সরকারের নীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপরই বর্তায়— কোনো হিন্দুজাতির উপর নয়।

একটি পুরোনো পরিভাষার নতুন পাঠ

অর্থনীতিবিদ রাজকৃষ্ণ প্রথম 'হিন্দু গ্রোথ রেট' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের দীর্ঘস্থায়ী নিম্ন প্রবৃদ্ধিকে বোঝাতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতির মন্থর গতিকে চিহ্নিত করা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিভাষা এক ভিন্ন রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অভিঘাত বহন করতে শুরু করে। দেশের নীতিগত ব্যর্থতার পরিবর্তে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যতার পরিচয় যেন ক্রমশ সেই ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে উঠল। অথচ অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করে সরকার, বাস্তবায়ন করে সরকার, তার ফলও ভোগ করে সরকার। বর্তমানে হিন্দু সমাজ এদেশের অর্থনৈতিক নীতির নির্মাতা নয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে— যদি কেন্দ্রীয় সরকারি নীতিই নিম্ন প্রবৃদ্ধির জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তবে সেই সময়ে 'কংগ্রেস গ্রোথ রেট' বা 'নেহরুবাদীগ্রোথ রেট'-এর মতো কোনো পরিভাষা জনপরিসরে প্রতিষ্ঠা পেল না কেন? অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দায়টি শেষ পর্যন্ত একটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপরই এসে বর্তাল কেন? এই প্রশ্নগুলিই আজ নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত এক বিশেষ বৌদ্ধিক পরিসরে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার সঙ্গে 'হিন্দু' শব্দটির এই প্রতীকী সংযুক্তি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সেই ধারণাকে নতুন করে যাচাই করার সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রায় ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি নিয়ে ভারত আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তৃতীয় স্থানে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠছে। এটি নিছক পরিসংখ্যানের পরিবর্তন নয়; এটি স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক বয়ানকেও নতুন ভাবে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে। যে শব্দবন্ধ একসময় ভারতের অর্থনৈতিক স্থবিরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো, আজ সেটিই নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে। কারণ বাস্তবতা স্পষ্ট, অর্থনৈতিক সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার দায় হিন্দু সমাজের নয়; তার দায় সরকারের নীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের।

এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মন্তব্য কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়; এটি বহু দশক ধরে প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধিক কাঠামোকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তাঁর বক্তব্য সেই পুরোনো অভিধাটিকে নতুনভাবে পড়ার আহ্বান জানায়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে যদি সত্যিই তথ্য, নীতি ও বাস্তবতার আলোকে বিচার করা হয়, তবে 'হিন্দু গ্রোথ রেট' শব্দবন্ধটিকেও নতুন করে মূল্যায়ন করতেই হবে।

আজকের ভারতের আত্মবিশ্বাসী অর্থনীতি, দ্রুত পরিকাঠামো নির্মাণ, উৎপাদনশীলতার বিস্তার, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের সক্ষমতা ও আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে অগ্রযাত্রা— সব মিলিয়ে একটি বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অর্থনীতির ইতিহাস ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে লেখা যায় না। দেশের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার বিচারও শেষপর্যন্ত দেশের নীতির ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। সেই কারণেই 'হিন্দু গ্রোথ রেট' আজ আর কেবল একটি অর্থনৈতিক পরিভাষা নয়; এটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ও ঐতিহাসিক বয়ানকে নতুন করে ফিরে দেখার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য।

তথ্যসূত্র : এই নিবন্ধে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান মূলত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের অনলাইন তথ্যভাণ্ডার থেকে গৃহীত।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কার্শিয়াং কলেজের ইংরেজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর)

সংসদীয় রীতি-নীতি এবং বিরোধীদের ভূমিকা

রানার চট্টরাজ

সম্প্রতি ২ দিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ, কয়েকটি রাজ্য বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষবৃন্দ এবং মান্যবর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। লোকসভার অধ্যক্ষ যথার্থই বলেছেন, আইনসভার কাজ নিছক আইন প্রণয়ন করা নয়, জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, সরকারের দোষত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং প্রয়োজনে গঠনমূলক প্রস্তাব দেওয়া। যথার্থই বলা হয়, আইনসভা বিরোধীদের জন্য। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিধানসভা মন্দিরের মতো। এই মন্দিরকে কলুষিত করা ঠিক নয়। বিরোধীরা বিধানসভায় নানাভাবে আলোচনা করতে পারেন এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সুসংগঠিত বিরোধী দল না থাকলে সরকার পক্ষেরই ক্ষতি। গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকে এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই প্রবন্ধকারকে বলেছিলেন, ১৯৭২-৭৭ এ শাসক কংগ্রেস দল নানা গোষ্ঠী, উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । তার একটা অন্যতম কারণ ছিল, সেই সময় বিধানসভা কার্যত বিরোধীশূন্য ছিল । বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন । তাদের সঙ্গে নিজে উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করছেন এবং পরামর্শ চাইছেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসক পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিরোধীদের হাতে কয়েকটি গণতান্ত্রিক অস্ত্র আছে। সংক্ষেপে আলোচনা করছি ।

(১) সরকারকে নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো প্রশ্ন (Question)। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মের ৩৫ নম্বর এবং ৩৬ নম্বর ধারা অনুসারে, যে কোনো মাননীয় বিধায়ক বিধানসভার সচিবকে উদ্দেশ্য করে লিখিতভাবে (নির্দিষ্ট ফর্মে) প্রশ্ন জমা করতে পারেন। ১২ দিনের (রবিবার এবং ছুটির দিন বাদ দিয়ে) নোটিশ প্রয়োজন। প্রশ্ন দু'ধরনের হতে পারে— (ক) তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন (খ) অতারকা চিহ্নিত প্রশ্ন। বিধায়ককে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে তিনি কোন্ ধরনের প্রশ্ন করতে চান (৩৮ নম্বর ধারা)। তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিধানসভার মধ্যে মৌখিক ভাবে দেবেন। অতারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দেওয়া হয়। এক দিনে কোনো বিধায়ক তিনটির বেশি তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন করতে পারবেন না [৩৯(১) ধারা]। অধ্যক্ষ নির্ধারণ করবেন কোনো প্রশ্ন বৈধ কিনা এবং যে কোনো প্রশ্ন বাতিল করবার চূড়ান্ত ক্ষমতা অধ্যক্ষের রয়েছে (৪৫ নম্বর ধারা)। প্রশ্ন করার কিছু শর্ত আছে। ৪৩(২) ধারায় এই শর্তগুলি উল্লিখিত রয়েছে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ চলবে না, কোনো ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। কোনো মতামত চাওয়া চলবে না, বিচারাধীন বিষয় সম্পর্কিত বা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয় বা বন্ধু বিদেশি রাষ্ট্র সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে প্রশ্ন করা চলবে না । ৪৩ (১) ধারা অনুসারে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো— মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে তাঁর প্রশাসনিক দপ্তরের কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

আগেই বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী

মহোদয় তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেবেন। উত্তর দেওয়ার পর সেই উত্তর সংক্রান্ত অতিরিক্ত প্রশ্ন (Supplementary Question) বিধায়করা করতে পারেন। কোনো বক্তৃতা করা চলবে না। অধ্যক্ষ কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন বাতিল করতে পারবেন [৫৩(১) এবং (২) ধারা]। এই প্রশ্নের মাধ্যমে নেহেরুর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে অনেক বড়ো বড়ো আর্থিক ও অন্যান্য কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এসেছে।

(২) আধ ঘণ্টার আলোচনা : ৫৮ নম্বর ধারা অনুসারে তারকা চিহ্নিত প্রশ্নে মন্ত্রী মহোদয়ের মৌখিক উত্তর এবং অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে পর্যাপ্ত জনস্বার্থে বিষয়টি নিয়ে আরো বিশ্লেষণ ও ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে যদি অধ্যক্ষ মনে করেন, তাহলে তিনি ৩০ মিনিটের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনার অনুমতি দিতে পারেন।

(৩) প্রস্তাব : ১৬৬-১৬৮ ধারা অনুসারে জনস্বার্থ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে বিধায়করা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ অধ্যক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আপত্তি করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাবক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে পারেন বা অস্বীকার করতে পারেন। প্রত্যাহারে অস্বীকার করলে প্রস্তাবক শুধুমাত্র প্রস্তাবের Title-টি বলবেন কিন্তু বক্তৃতা করবেন না। মন্ত্রী মশাই আপত্তি না করলে প্রস্তাবক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করবেন, কিন্তু কোনো বিতর্ক হবে না।

(৪) দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ : ১৯৮, ১৯৮(1A) ও ১৯৮(২) ধারা অনুসারে বিধায়করা জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয় সম্পর্কে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এই সম্পর্কে নোটিশ বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগেই জমা করতে হবে। অধ্যক্ষের অনুমোদন আবশ্যক। বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় সেই দিনই বিবৃতি দিতে পারেন বা পরবর্তী কোনো দিন লিখিত বিবৃতি পেশ করতে পারেন। তবে এই বিবৃতির উপর কোনো বিতর্ক হবে না।

(৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের আলোচনা : ১৯৪ এবং ১৯৫ ধারা অনুসারে জনস্বার্থ সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আড়াই ঘণ্টা আলোচনা হতে পারে। এই মর্মে যে কোন বিধায়ক অধ্যক্ষের কাছে নোটিশ পাঠাতে পারেন। নোটিশের সঙ্গে কেন তিনি বিষয়টি তুলতে চান এবং কেন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কে লিখিত নোট দেবেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করে অধ্যক্ষ অনুমতি দিলে দুঘণ্টা তিরিশ মিনিট আলোচনা হতে পারে।

(৬) উল্লেখ পর্ব : কোনো বিধায়ক দিনে দিনে নোটিশ দিয়ে কোনো বিষয় বিধানসভায় উল্লেখ করতে পারেন। বলবার জন্য ২/৩ মিনিট সময় দেওয়া হয়। একই দিনে নানা বিষয়ে অনেকেই উল্লেখ করেন। নিয়ম অনুযায়ী, বক্তৃতার বিষয়টি বিধানসভার সচিবালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয় প্রশাসনিক দপ্তরের বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য। বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলে প্রথম দু'ঘণ্টা ধার্য থাকে প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এবং উল্লেখ পর্বের জন্য।

(৭) মুলতুবি প্রস্তাব : জনস্বার্থ সংক্রান্ত সাম্প্রতিককালে ঘটেছে এমন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য সদস্যরা (বিধায়করা) মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। অধ্যক্ষ অনুমতি দিলে উল্লিখিত দিনের সমস্ত কার্যক্রম বাতিল করে মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে (৫৯ - ৬০ ধারা)।

(৮) অনাস্থা প্রস্তাব : ১৯৯ ধারা অনুসারে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায়। শাসকদলের যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তাহলে অনাস্থা প্রস্তাবটি ভোটাভুটিতে পরাস্ত হবেই। বিরোধী পক্ষ এটা জানে। তবুও এটা একটা রাজনৈতিক কৌশল। জনমতকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা মাত্র।

এছাড়া বাজেট অধিবেশন বিধানসভার সদস্যদের কাছে, বিশেষ করে বিরোধী সদস্যদের কাছে অপূর্ব সুযোগ। বাজেট পেশ করার পর এবং তৎসংক্রান্ত বিতর্কের পর প্রতিটি প্রশাসনিক দপ্তরের আলাদা আলাদা ব্যয়বরাদ্দ পেশ করা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। সাধারণত একটা দিন একটা মাত্র দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হয়। বিধায়করা দপ্তরের কার্যাবলী নিয়ে, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে উল্লেখ করতে পারেন, অনেক কিছুই হয়ত মন্ত্রীর গোচরে থাকে না। মন্ত্রীমহোদয় খোঁজ খবর করেন। তাঁকে বিতর্কের শেষে জবাবি ভাষণ দিতে হয়। আইনসভা নিছক হই হট্টগোলের স্থান নয়। গঠনমূলক সমালোচনা ও আলোচনার স্থান।

বিরোধীদের বিধানসভায় ভূমিকা সব সময় সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। গুণগত মানের ওপর নির্ভর করে। ১৯৮০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যা ৪০ এর বেশি ছিল না। তবুও মাত্র ৮/১০ জন বিধায়ক বিধানসভা কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এ-ছাড়া অতীশ সিনহা, ড. জয়নাল আবেদিন, ড. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখর নাম উল্লেখ করা যায়। বাজেট বরাদ্দে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তর, উল্লেখ পর্ব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব প্রভৃতি সংসদীয় পদ্ধতির উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা নিরন্তন সরকারকে চাপে রাখতেন, যদিও বামফ্রন্ট সরকারের অবাধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৮০টি আসন পেয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ বিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারত। সেটা সরকারের পক্ষে মঙ্গলের ছিল। কিন্তু দলটাই ভেঙে গেল। এটা কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে আশঙ্কার কথা।

বিরোধী ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে মনে পড়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। তিনি একাই লোকসভা কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর মুখোমুখি হতে অস্বস্তি বোধ করতেন। অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা তাঁর ছায়ামাত্র ছিলেন। তাই শ্যামাপ্রসাদকে সংসদের সিংহ (The Lion of Parliament) বলা হতো।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কল্যাণী নিবাসী সুনীল মুন্সী গত ২২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, পুত্র, কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে হলেও চাকরিসূত্রে বিহারের পাটনাতে তিনি

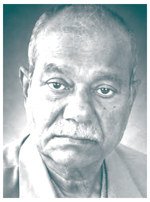

স্বয়ংসেবক হন এবং কয়েক বছর প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে স্থায়ী হয়ে এলাকার সঙ্ঘকাজের ভিত স্থাপন করেন। উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৯৫)

শব্দ প্রয়োগ বাক্য প্রয়োগ

একটা ছোট্ট শব্দ, একটা ছোটো কথার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। অনুপযুক্ত কথা হলে একটি সংগঠনের পক্ষে তা অহিতকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। কথার মধ্যে শব্দ ব্যবহারে তাই ডাক্তারজী সদা সচেতন থাকতেন এবং নিজে অত্যন্ত মননশীলতার সঙ্গে সংগঠনানুকূল বাক্য প্রয়োগ করতেন। অন্য স্বয়ংসেবকের কথাবার্তার প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকতো।

ডাক্তারজী তখন রাজগিরে। সেই সময় বর্ষপ্রতিপদ উৎসবে পুনার জেলা সঙ্ঘচালক ভাওরাও দেশমুখ স্বয়ংসেবকদের সামনে একটি ভাষণ দেন। সংবাদপত্রে ভাষণটি পড়ে ডাক্তারজী সংশয়যুক্ত, একটি বাক্যের নীচে লাল কালিতে দাগ দিয়ে রাখেন। পুনায় ফিরে ভাউরাও দেশমুখজীর সঙ্গে দেখা হলে পুরানো সংবাদপত্র বের করে সেই লালকালিতে দাগ দেওয়া বাক্যটি দেখালেন, যেখানে কোনো রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে একটি কথা ছিল। ডাক্তারজী বললেন এ ধরনের উক্তির প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা ভেবে নেওয়া প্রয়োজন। ডাক্তারজীর শব্দ চয়নের মাপ ছিল জহুরির মাপ। সঙ্ঘের কার্যক্রম সময় মতো শুরু হবে— সমাজ মনে এই মর্যাদা সৃষ্টির জন্য আমন্ত্রণপত্রে 'ঠিক অমুক সময়ে কার্যক্রম শুরু হবে'— এই লেখার পদ্ধতি তিনি শুরু করেন। সঙ্ঘের এক উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র তৈরির দায়িত্ব একজন স্বয়ংসেবককে দিলে তিনি প্রচলিত বয়ান অনুসারে 'আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' লেখেন। ডাক্তারজী তা পরিবর্তন করে 'আমাদের সকলের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাক্তারজীর লক্ষ্য ছিল সঙ্ঘ যেন সমাজ থেকে আলাদা না হয়ে যায়। তিনি বারবার বলতেন স্বয়ংসেবকদের একদম মেপে ওজন করে কথা বলা উচিত। কোনো ক্ষতিকর অর্থহীন শব্দ উচ্চারিত হওয়া ঠিক নয়। একবার এক স্বয়ংসেবক ভাষণে রাজপুত কন্যার বীরত্ব, ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য জহরব্রত প্রসঙ্গে বলার সময় 'রাজপুত রমণী' শব্দ প্রয়োগ করেন। পরে ডাক্তারজী সেই কার্যকর্তাকে ডেকে বলেন এসব ক্ষেত্রে এমন মহীয়সী মহিলাদের জন্য 'রাজপুত দেবী' শব্দ ব্যবহার করাই উপযুক্ত। এমন হিসেব করে বাক্য ব্যবহারের ফলে ডাক্তারজীকে কোনোদিন কোনো কথার জন্য তাকে পরে বলতে হয়নি— 'আমি এমন বলতে চাইনি' বা 'আমার বলার অর্থ এমনটা ছিল না'। ডাক্তারজীর বক্তব্যগুলি ছিল তার জীবনাদর্শের প্রতিবিম্ব। বলা হয় জীবন রূপী মুদ্রার কৃতি ও উক্তি এপিঠ আর ওপিঠ। ডাক্তারজীর জীবনে কৃতি ও উক্তি দুটোই ছিল অত্যন্ত প্রভাবশীল, অনুকরণীয়।

(৯৬)

স্বীকৃতি ও অভিনন্দন

মূল ঘটনাটি আগের। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতে তিনি যখন পতাকা উত্তোলন করছিলেন তখন হঠাৎ পতাকার দড়ি চাকা থেকে খুলে গিয়ে আটকে যায় এবং পতাকা মাঝপথে আটকে থাকে। আশি ফুট উঁচু ধ্বজদণ্ডে অনেকে ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু সাহসে কুলোয় না, তারা নেমে পড়ে। ঘটনাচক্রে শিবপুর শাখার স্বয়ংসেবক কিসন সিংহ পরদেশী সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর পতাকা উত্তোলনে এই সংকট অবস্থা দেখে তিনি এগিয়ে আসেন আর অনায়াস ভঙ্গিতে তর্ তর্ করে ধ্বজ দণ্ড বেয়ে উঠতে থাকেন। উপস্থিত জনতা বিস্মিত চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। ততক্ষণে কিসন সিংহ পতাকার দড়ি ঠিক করে নেমে আসেন। এক রকম অধিবেশনের শুরুতেই এমন সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ায় তিনি নেমে আসতেই সকলে তাকে কাঁধে তুলে নাচতে থাকে এবং জনতা আক্ষরিক অর্থে তার ওপরে টাকা বর্ষণ করতে থাকে। ঠিক হয় প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হবে। কিন্তু যখন জানা গেল যে, তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, তখন এই অভিনন্দন জানাবার কার্যক্রম রদ করে দেওয়া হলো।

সেই বছরই মার্চ মাসের দিকে ডাক্তারজী নাসিকে গেলে এই ঘটনার কথা শুনতে পান এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। নাসিক ভ্রমণ সেরেই তিনি ধুলে শাখায় যান এবং কিসন সিংহকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে কথা বলেন। দেবপুরা শাখায় অভিনন্দন জানিয়ে ডাক্তারজী একটি রুপোর পদক তাকে উপহার দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি কথা সকলের সামনে বলেন তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, মননযোগ্য। তিনি বলেন--- 'দেশের কাজ যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হবে, সেখানেই দলের কথা চিন্তা না করে এগিয়ে এসে তাতে হাত লাগাতে হবে'। কিসন সিংহ এমন কাজটি করেছিলেন বলে তিনি তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দেন। ডাক্তারজীর চিন্তায় তাঁর গভীর দেশভক্তির প্রতিফলনে মহাভারতে ভাইদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সেই শাশ্বত বাক্যটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে— 'বয়ং পঞ্চাধিকং শতম্'।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোটো গল্প
প্রবন্ধ

সত্বর আপনার কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা